ফাঁসির মঞ্চে কর্নেল তাহের

একটি অজানা কাহিনী

আনোয়ার কবির

সূচি

ভূমিকা

কর্নেল আবু তাহেরের ফাঁসির ঘটনাটি বাংলাদেশের ইতিহাসের মতোই ট্র্যাজিক। Mother Revolution divorce her own son, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটিই ঘটেছে। শেখ মুজিব, জিয়া, মঞ্জুর, তাহের, সিরাজ শিকদার, এঁরা সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমিক, তা সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে এঁদের প্রত্যেকেই একজন আরেকজনের হাতে নিহত হয়েছেন। এই প্রক্রিয়াটাকে ইতিহাসের একটি দুষ্টচক্র বলা চলে। ফরাসী বিপ্লবের সময় যে ভদ্রলোক গিলোটিন অর্থাৎ যে হনন যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন ভাগ্যের পরিহাস এই যে, সেই ভদ্রলোককেও গিলোটিন যন্ত্রে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

নাজী জার্মানিতে একজন সৈন্য যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য 'সিলভার ক্রস' লাভ করেছিলো। পরে দেখা গেলো সে সৈনিকটি ব্রিটিশের গুপ্তচর। সেনা আইনে মৃত্যুদণ্ড হলো গুপ্তচর বৃত্তির একমাত্র শাস্তি। কিন্তু এই বিশেষ সৈনিকটির বিষয়ে রায় দিতে গিয়ে ট্রাইবুনালের বিচারকরা একটু গোলমালে পড়ে গেলেন। তাঁরা মেনে নিলেন গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু জার্মান সিলভার ক্রসের একটি সম্মান রয়েছে। এই সৈনিকটি গুপ্তচর হওয়া সত্ত্বেও বীরত্ব প্রদর্শন করে সিলভার ক্রস পেয়েছে। এই সিলভার ক্রসের সম্মান রক্ষা করাও জার্মান জাতির একটি পবিত্র কর্তব্য। যে লোক সিলভার ক্রস পেয়েছে অপরাধী হলেও তাঁকে হত্যা করা যায় না। বিচারকেরা একমত হলেন, মৃত্যুদণ্ডের বদলে সৈনিকটিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। হিটলারের নাজী জার্মানিতে যে ধরনের মানবিকতা এবং সংবেদনশীলতা দেখানোর প্রমাণ মিলে তাহেরের বেলায় বাংলাদেশের সামরিক জান্তা তার ধারে কাছে যায় এমন কোন অনুকম্পাও প্রদর্শন করতে পারেনি। এটা সেই সামরিক জান্তার নিষ্ঠুরতা বললে পুরুষত্ব বলা হয় না, পুরুষত্ব এই যে বাংলাদেশের সমাজ ঠাণ্ডা মাথায় করা খুন মেনে নিয়েছে। সমাজে যাদের প্রতিষ্ঠা আছে এরকম কোন মহল থেকে কোন সংঘটিত প্রতিবাদ এ পর্যন্ত আসেনি।

তাহের হত্যার ঘটনাটি আমাদের ইতিহাসের একটি পরশ পাথর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে অনেকদিন পর্যন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে বিবেচিত হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তাহেরকে নিয়ে নাটক লেখা হবে, উপন্যাস লেখা হবে এবং তাঁর আত্মদানকে বিষয়বস্তু করে তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা গ্রন্থও প্রকাশিত হবে, আমার মনে হচ্ছে সে প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে গেছে। বর্তমান লেখক আনোয়ার কবির-এর এই সরল প্রতিবেদনমূলক সাদামাঠা ছিপছিপে বইটি তার ইঙ্গিতবহ। তাহেরের উপর সিরিয়াস গবেষকরা নানা পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশ করে চলেছে। নিশ্চয়ই সেগুলো তাহেরের চিন্তা এবং কল্পনা বিশদভাবে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। কবিরের এই রচনাটি পরিচিতিমূলক তাতে কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশা করলেও পাঠককে নিরাশ হতে হবে। বয়সে কবির তরুণ। তিনি লেখালেখির ক্ষেত্রে এই যে, সামাজিক দিকটাকে বেছে নিয়েছেন এটা তারিফ করার মতো ব্যাপার। আমি আশা রাখবো, তাঁর আগামী রচনাসমূহ আরো অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং গভীরতা অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং আনোয়ার কবির একজন মননশীল ধীমান গবেষক হিসাবে স্থান অধিকার করতে পারবেন।

ইহা, ১০২/এ
আজিজ কো-অপারেটিভ
সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

আহমদ ছফা
০৮. ১২. ৯৫

দেশের প্রথম বিশেষ সামরিক আদালতের কয়েকদিন

মোট অভিযুক্ত	:	৩৩ জন
প্রধান আসামী	:	লেঃ কর্নেল আবু তাহের (অবঃ), বীর উত্তম
গ্রেফতার	:	২৪ নভেম্বর ১৯৭৫
আদালত গঠন	:	১৪ জুন ১৯৭৬ (১নং সামরিক আদালত)
চেয়ারম্যান	:	কর্নেল ইউসুফ হায়দার
কোর্ট মার্শাল শুরু	:	২১ জুন ১৯৭৬
রায় ঘোষণা	:	১৭ জুলাই ১৯৭৬, বিকেল ৩টা
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর	:	২১ জুলাই ১৯৭৬, ভোর ৪টা।

সর্বমোট কোর্ট মার্শালের কার্যক্রম ২৬ দিন !

প্রথম সামরিক আদালত, প্রথম ফাঁসি

১৫ আগস্ট ১৯৭৫। দেশে সংঘটিত হয় প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান। নিহত হন সপরিবারে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৩ নভেম্বর খালেদ মোশারফ ও শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় দ্বিতীয়বারের মতো সামরিক অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থানের পর একদিকে অভ্যুত্থানকারীরা ক্ষমতার দণ্ড নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। অপরদিকে ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারীরা কারাগারের সেলে বন্দী আওয়ামী লীগের ৪ নেতা যারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জাতীয় নেতাতে পরিণত হয়েছেন তাদেরকে হত্যা করে বিদেশে পাড়ি জমায়। খালেদ মোশারফ একজন দক্ষ ও সাহসী অফিসার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিলেন নিতান্তই অনভিজ্ঞ ও অপারদর্শী। তাই অভ্যুত্থানের পরই পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণে তিনি দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। আর এই সিদ্ধান্তহীনতার জন্যই অপমৃত্যু ঘটে তাঁর অভ্যুত্থানের। খালেদ মোশারফ অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা দখলের পর জিয়াউর রহমানকে গ্রেফতার করেন। এই দিনই জিয়া তাহেরকে ফোন করে জানান, তাহের, সেভ মাই লাইফ...ত্ব। কথা শেষ হওয়ার আগেই কে যেন ফোনের রিসিভার কেড়ে নেয়। তাহের বুঝতে পারেন জিয়া খালেদ মোশারফ গ্রুপের হাতে বন্দী।

জিয়া ও তাহের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাহের অবসরপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও জিয়া তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। তাই জিয়া গৃহবন্দী হওয়ার সময়ই আসন্ন বিপদের কথা ভেবে ফোন করে তাহেরের সাহায্য কামনা করেন। এই অনুরোধ অনুযায়ীই তাহের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে সিপাহী বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে খালেদ মোশারফের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে নির্দেশ দেন। যার পরিণতিতে সংঘটিত হয় সিপাহী বিদ্রোহ। মুক্ত হয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন জিয়া।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭২। কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী হতে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের পর তাহের নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাসদের সঙ্গে যুক্ত হন। '৭৪ সালে জাসদ বিপ্লবী গণবাহিনী গড়ে তুললে তাহের নেতৃস্থানীয় পদ লাভ করেন। তাঁরই উদ্যোগে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা গড়ে ওঠে। এ সংস্থার সৈনিকরা তাহেরের নারায়ণগঞ্জের বাসায় আসা-যাওয়া করত। জাসদের জনসভাগুলোতে সাধারণ পোশাকে সৈনিকেরা ভাষণ শুনতে আসত। ৩ নভেম্বর খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানের আগের দিন ২ নভেম্বর থেকেই তাহের অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর মধ্যে নানা দুশ্চিন্তায় থেমে থেমে সারা ঘর পায়চারি করছিলেন। এ সময় তাঁর বাসার টেলিফোন বেজে

ওঠে। ঢাকা থেকে হাসানুল হক ইনু, সিরাজুল আলম খান ফোনে তাহেরকে ঢাকায় ভয়ার্ত এবং নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির খবর দেন। এ দিন বিকালে বেশ কিছুসংখ্যক সিপাহী, এনসিও (নন কমিশন্ড অফিসার), জেসিও (জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসার) তাহেরের নারায়ণগঞ্জের বাসায় আসে। অসুস্থতার জন্য তাহের সকলের সঙ্গে দেখা করেননি। শুধুমাত্র কয়েকজন এসে শয়নকক্ষে তাহেরকে সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মাঝে চরম উত্তেজনার কথা তারা তাহেরকে জানায় এবং এ পরিস্থিতিতে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ চায়। তাহের তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে বিদায় দেন। ৫ ও ৬ নভেম্বর মুসলিম লীগ ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল সেনানিবাসে ও সারা দেশে লিফলেট ছড়িয়ে দেয়। এ সব লিফলেটে খালেদ মোশারফকে দেশদ্রোহী ও ভারতের দালাল হিসাবে আখ্যায়িত করে বলা হয় যে, খালেদ মোশারফ বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিতে চায়। এ সময় সকল রাজনৈতিক দলই ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু জাসদ কাজ করেছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা এবং বিপ্লবী গণবাহিনীর আবরণে। লিফলেটগুলোর মধ্যে জাসদ এবং মুসলিম লীগ উভয় রাজনৈতিক দলই একটি বিষয়ে একমত ছিল। আর তা হচ্ছে খালেদ একজন বিশ্বাসঘাতক, ভারতের দালাল এবং সে ঘৃণিত বাকশাল ও মুজিববাদ ফিরিয়ে আনতে চাইছে। জীবন দিয়ে হলেও এ সরকারের পতন ঘটান।

জাসদ একধাপ আরও এগিয়ে গেল। তারা বলল সিনিয়র অফিসাররা নিজেদের স্বার্থে জওয়ানদের ব্যবহার করছে। সাধারণ মানুষ ও জওয়ানদের ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা নেই। গণ-জাগরণের ডাক দিয়ে জাসদ ১২টি দাবি পেশ করে।* এগুলোর মধ্যে ছিল ব্যাটম্যান প্রথা বাতিল করতে হবে। সৈন্যদেরকে অফিসারদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা চলবে না। পোশাক ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে জওয়ান ও অফিসারদের ব্যবধান দূর করতে হবে। দূর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে, সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিতে হবে। জাসদের দাবিসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে সৈনিকদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়।১

ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের হাবিলদার বারী জাসদের লিফলেটের ভাষা লিখেন এবং কর্নেল তাহের তা অনুমোদন করেন। তাহেরের অগ্রজ আবু ইউসুফের বাসা থেকে সৈনিক সংস্থার ইউনিট প্রধানরা লিফলেটের বাণ্ডিলগুলো নিয়ে যায় এবং বিলি করে। ৬ নভেম্বর বিকালে সৈনিক সংস্থার কিছু সংখ্যক এনসিও, জেসিও, নারায়ণগঞ্জে তাহেরের বাসভবনে আসে। তাদের নেতা ছিল কর্পোরাল ফকরুল। এ দলের সঙ্গে তাহের ঢাকায় আসেন। অসুস্থতার কথা বলা হলে তিনি ইনজেকশন নেন। একটা বড় স্টেশন ওয়াগন গাড়িতে শুয়ে তাহের ঢাকায় আসেন। গাড়িটি এলিফ্যান্ট রোডে তাহেরের অগ্রজ আবু ইউসুফের বাসায় এসে থামে। পাশেই থাকতেন ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ওয়েভ' পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর টেলিফোনে জাসদ নেতা যারা জেলের বাইরে ছিলেন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। ডঃ আখলাকুর রহমান, সিরাজুল আলম খান, হাসানুল হক ইনু

* ১২ দফা দাবিনামা পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া হলো

বাসায় চলে আসেন। তাহের সবাইকে পরিস্থিতি এবং সৈনিকদের মনোভাব ব্যাখ্যা করে বলেন, 'অতিদ্রুত পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে পারি।' পরের দিন সকালে ডঃ আখলাকুর রহমানের বাসায় আবার বৈঠক হয়।

৬ নভেম্বর সন্ধ্যাতেই আবু ইউসুফের বাসায় কর্নেল তাহের সৈনিক সংস্থার কমাণ্ডারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারিত হয় ৭ তারিখ রাত ১টা। সিগন্যাল রেজিমেন্টের নায়েক সিদ্দিকের উপর দায়িত্ব দেয়া হয় জিয়াউর রহমানকে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়া। আর্মী হেড কোয়ার্টারের দায়িত্ব দেয়া হয় সুবেদার মাহবুবকে। বঙ্গভবনের দায়িত্ব দেয়া হয় সুবেদার জালালকে। রেডিও স্টেশনের দায়িত্ব দেয়া হয় সুবেদার শামসুলকে।

গুলশানে প্রকৌশলী আনোয়ার সিদ্দিকের বাসায় পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়। বিরাট হলরুমে সৈনিকদের সভায় হাসানুল হক ইনু উপস্থিত ছিলেন। বেশকিছু সৈনিক বক্তব্য রাখে। তাদের বক্তব্য ছিল আমাদের দূর্নীতিবাজ অফিসারদেরকে আমরা দেখব। আপনারা দেশের দূর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের একটা কিছু করবেন। তারা বুঝেছে খারাপ লোকদের হত্যা করাই বিপ্লব। কিন্তু তাহের বোঝাতে চাইলেন—'বিপ্লব মানেই হত্যাকাণ্ড নয়'। সিদ্ধান্ত হয় টু-ফিল্ড আর্টিলারিতে অফিসারদেরকে ধরে নিয়ে আসা হবে। জিয়াউর রহমান তখন অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাতে বন্দী। পরিস্থিতি এমন যে কোন মুহূর্তে তাকে মেরে ফেলা হতে পারে।

সিদ্ধান্ত হয় রাত একটায় জিরো আওয়ার। ঠিক হয় অভ্যুত্থান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে গণবাহিনীর একটি দল মাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। নীলক্ষেতের একটি দোকান থেকে মাইক সংগ্রহ করা হয়। রাত ১২টা। সুবেদার মেজর আনিসুল হকের ইঙ্গিতে টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের লাইন থেকে একটা মাত্র ট্রেইসার বুলেটের আলো অন্ধকার ভেদ করে আকাশে উঠলো।

এটাই ছিল সঙ্কেত। ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে 38-LAA প্রচণ্ড শব্দে আকাশে এ্যাক্-এ্যাক গান ফায়ার করে তার জবাব দেয়। আর সৈন্যরা ব্যারাক থেকে বের হয়ে পড়ে অস্ত্র নিয়ে। তাদের মুখে শ্লোগান 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই সুবেদারের উপর অফিসার নাই, 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই অফিসারের রক্ত চাই।" মুহূর্তে ঢাকা সেনানিবাসে বিদ্রোহ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সৈনিকদের যত্রতত্র আকাশের দিকে গুলিবর্ষণ ও শ্লোগানে ঢাকা সেনানিবাস এলাকা কেঁপে ওঠে। বলা যায়, জাসদের শ্রেণী সংগ্রামের ডাকে আপাতদৃষ্টিতে সৈনিকেরা অফিসারদেরকে হত্যা করা শুরু করে। এভাবে যেসকল সৈনিক ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানকারী অফিসারদের বিদেশ যাওয়ার ফলে ভীত হয়ে পড়েছিলেন এখন তারা কর্নেল তাহেরের আহ্বানে সিপাহী বিদ্রোহে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

সিপাহী বিপ্লবের প্রথম ধাক্কা লাগে দশজন তরুণ আর্মি অফিসারের উপর। এরা ছিল দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারী ব্যারাকের কাছে একটি অফিসার্স মেসে। অফিসারদের একজন 'ব্যাটম্যান' এই সময়ে বারান্দা দিয়ে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলতে

লাগলো, 'জীবন নিয়ে পালান। সিপাইরা আপনাদের খুন করতে আসছে।' অফিসারেরা বিন্দুমাত্র দেরি না করে সাদা পোশাকে মেসের পিছন দিকের দেয়াল টপকে চলে এলেন সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের পিছনের ধানক্ষেতে। তারপর গ্রামের লোকজনের সহায়তায় তারা মিরপুর রোডের মধ্য দিয়ে শহরের নিরাপদ স্থানে চলে যায়। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন বেগম জিয়ার ছোটভাই সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সাঈদ ইসকান্দার।২ সিপাহীরা অল্প সময়েই ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেয়।

প্ল্যান অনুযায়ী রাত আড়াইটায় গণবাহিনীর একটি টিম মাইক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় মাইকিং। মাইকিং-এর ভাষা ছিল —'বাংলাদেশ দেশপ্রেমিক গণবাহিনী, সেনাবাহিনী, বিমান, নৌবাহিনী, বিডিআর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছে। জনসাধারণকে অনুরোধ করা হচ্ছে রাস্তায় বেরিয়ে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করুন'। এদিকে রাত একটায় সুবেদার সারোয়ারের নেতৃত্বে একদল সৈনিক গৃহবন্দী জিয়াকে মুক্ত করে ঘাড়ের উপর বসিয়ে বিজয়োল্লাস করতে করতে দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সদর দফতরে নিয়ে আসে। জিয়ার তখন উস্কু-খুস্কু চেহারা। সৈন্যরা তাকে মুক্ত করে বলল, 'সিপাহী বিপ্লব শুরু হয়েছে—কর্নেল তাহের আমাদের নেতা আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।" জিয়া নাটকীয়তার আশ্রয় নিয়ে চিৎকার করে বলেন—'তাহের আমার বন্ধু সে কোথায়? এই ক্যান্টনমেন্ট তাকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল, সে এখান থেকে নেতৃত্বে দেবে। সে আমার নেতা। তাকে এখানে নিয়ে এসো।' জিয়ার আচরণে সৈনিকেরা মুগ্ধ হয়ে যায়। তাকে না নিয়েই ফিরে আসে।

এখান থেকে জিয়া প্রথম জেনারেল খলিলকে ফোনে জানান যে, তিনি মুক্ত। জিয়া উপস্থিত সৈনিকদের সাথে গভীর আনন্দে আলিঙ্গন করেন এবং ব্রিগেডিয়ার মীর শওকত, কর্নেল আব্দুর রহমান ও কর্নেল আমিনুল হককে নিয়ে আসতে বলেন। তিনি সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, তিনি রক্তপাত চাননা। সবাইকে শান্ত হতে বলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সবার সাহায্য কামনা করেন। তারপর জিয়া বঙ্গভবনে অবস্থানরত শাফায়াত জামিলকে ফোন করেন এবং বলেন, 'লেটআস ফরগেট অ্যান্ড ফরগিভ অ্যান্ড ইউনাইট দি আর্মি।' শাফায়াত জামিলের তখনও ধারণা ছিল তার ব্রিগেডের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা তার প্রতি অনুগত আছে এবং তার আদেশ মান্য করবে এবং তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দেবে না। শাফায়াত জামিল জিয়াকে কর্কশভাবে জবাব দেন, 'নাথিং ডুয়িং উই উইল সর্ট দিস আউট ইন দি মর্নিং।' কিন্তু শাফায়াত জামিল বঙ্গভবনের দেয়াল অতিক্রম করে অপর পাশে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পায়ে গুরুতর আঘাত পেয়ে তিনি মুন্সীগঞ্জ চলে যান এবং মুন্সীগঞ্জের এসডিপিওর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তর করা হয়।৩

৭ নভেম্বর রাত ১-৩০ মিনিটে বিদ্রোহী সৈনিকরা বেতার কেন্দ্র দখল করে সিপাহী বিপ্লবের কথা ঘোষণা করে। তাহেরের অগ্রজ ইউসুফের বাসা থেকে আবু ইউসুফ, তাহের, ইনু ক্যান্টনমেন্টের দিকে জীপে রওনা হয়ে যান। তাহেরের অনুজ আনোয়ারকে

বাসায় রেখে যাওয়া হয় রেডিওর ঘোষণা ঠিক করার জন্য। সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়। রাস্তার মাইকের ঘোষণার অনুরূপ একটি ঘোষণা রেডিওর জন্য তৈরি করা হয়।

রাজশাহীর দৈনিক বার্তার শামসুদ্দিন তখন আনোয়ারের সঙ্গে ছিলেন। মোটর সাইকেলে দু'জন রেডিও অফিসের দিকে ছুটে যান। পিজির মোড়ে মেশিনগান হতে সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছিল। তারা বললেন, আমরা কর্নেল তাহেরের লোক। রেডিও অফিসে যাচ্ছি। ওরা স্যালুট করে পথ ছেড়ে দিল।

রেডিওতে ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীর প্রহরায় ছিলেন। সেখানে শামসুদ্দিনকে রেখে আনোয়ার ছুটে গেলেন মাইকিং এর ঘোষণা পরিবর্তনের জন্য। বলা হলো সবাই যেন শহীদ মিনারে যায়। সেখানে সৈনিক-জনতার মিলন সভা হবে। তেজগাঁও, পোস্তগোলার শ্রমিকরা দলে দলে রাস্তায় সৈনিকদের সঙ্গে মিছিল শুরু করে দেয়।

রাতেই ট্রাক ভর্তি আর্মি এসে তাহেরের অগ্রজ আবু ইউসুফের বাসার সামনে থামে। জওয়ানরা স্লোগান দিতে থাকে 'সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ'। এখানে কর্নেল তাহের নায়েক সিদ্দিকের কাছে জানতে চান, 'হয়্যার ইজ জিয়া?" নায়েক সিদ্দিক জবাব দেন, 'সব ঠিক আছে। জিয়া সাহেব আপনাকে নিতে পাঠিয়েছেন'। তাহের তখনই বুঝতে পারে জিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় সব ভুল হয়ে গেছে। সৈনিকরা কর্নেল তাহেরকে প্রথমে সকাল সাড়ে পাঁচটায় দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সদর দফতরে নিয়ে আসে। এখানে জিয়ার সঙ্গে তাহেরের অভ্যুত্থানের পর প্রথম দেখা হয়। ততক্ষণে বেশ কিছু অফিসারও সেখানে পৌঁছে যান। খন্দকার মোশতাকের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মাহবুবুল আলম চাষী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জিয়া তাহেরকে জড়িয়ে ধরে বললেন—'থ্যাংক ইউ তাহের, ইউ হ্যাভ সেভ দি নেশন, সেভ মাই লাইফ। নাউ হোয়াট এভার ইউ সে আই উইল মাস্ট ওবে।' তাহের তখনই বুঝে ফেললেন অভ্যুত্থানটি যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল জিয়াকে আনতে না পারায়, অফিসারদেরকে সংযুক্ত করতে না পারায় সেভাবে কিছুই হয়নি। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নেন— কোন কনফ্রনটেশন নয় একটা ডেমোক্রাটিক গবর্নমেন্ট যদি ফর্ম করানো যায় সেটাই হবে আপাতত সাফল্য। তাহের জিয়াকে বললেন, "সৈনিকদের বারো দফা মেনে নাও, প্রিজনারদের ছেড়ে দাও, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা কর।'

জিয়া সবকিছুতেই হাত নেড়ে সম্মতি জানান। সৈনিকরা কোরান শরীফ নিয়ে আসে। জিয়া তাতে হাত রেখে শপথ করেন। তাহের জিয়াকে রেডিওতে ভাষণ দিতে বলেন। জিয়া তা এড়িয়ে যেতে চেয়ে বলেন—'আমি তো বক্তৃতা দিতে পারি না। আমার পক্ষে তুমি রেডিওতে ভাষণ দাও।' জিয়া আরও বলেন—লুক তাহের, ইউ আর এ রিভ্যুলুশনারি আই অ্যাম নট।' তাছাড়া নিরাপত্তার স্বার্থে উপস্থিত অফিসারগণ জিয়াকে যেতে নিষেধ করেন। কর্নেল আমিনুল হকের প্রস্তাবে তখন জিয়ার একটি ছোট ভাষণ রেকর্ড করা হয় এবং পরে তা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। জিয়া

তাঁর সেই ভাষণে বলেন—সশস্ত্র বাহিনীর অনুরোধে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি সবাইকে শান্ত হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে নিজ নিজ কর্মস্থলে যোগদান করতে বলেন। এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ জনমনে বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। জনগণ রাজপথে নেমে আসে এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে কোলাকুলি শুরু করে।

তারপর তাহের জিয়াকে শহীদ মিনারে নিয়ে গিয়ে সমবেত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেয়ার অনুরোধ জানান। সম্ভবত তাহেরের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রণীত সিপাহীদের বারো দফা দাবির প্রতি জনসমক্ষে জিয়ার আনুগত্য প্রকাশ করিয়ে নেয়া। বারো দফা দাবি শুধু নেতৃত্ব পরিবর্তন করার জন্য দেয়া হয়নি, বস্তুত এই দাবিনামায় সেনাবাহিনীর কাঠামো পরিবর্তন করে সেনাবাহিনীকে দেশের দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রেণী সংগ্রামের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়। জিয়া বিনম্রভাবে তাহেরের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন।

পরে জিয়া বিকালে যখন বেতার কেন্দ্রে যান তখন ঘরভর্তি উত্তেজিত সিপাহীদের সামনে তাহের জিয়াকে বারো দফা দাবিনামা দেন এবং সই করতে বলেন। জিয়া উপায়ন্তর না দেখে সই করেন। কিন্তু বেতার ভাষণে সুকৌশলে বারো দফা দাবির কথা উল্লেখ না করে সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরে গিয়ে অস্ত্র জমা দিতে বলেন।[৪]

সকালে সৈনিক সংস্থার একটি দল কর্নেল তাহেরের নির্দেশে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জাসদের সকল রাজবন্দীকে মুক্ত করতে যায়। জেল কর্তৃপক্ষের নিদেশে সকল রাজবন্দী মুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এ সময় বন্দী জাসদ নেতা এ আওয়াল নির্দেশ দেন—'আমরা ক'জন এখন বেরিয়ে যাই পরে আপনাদের মুক্ত করা হবে।' এরপর আওয়াল শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান এবং জাসদের সহ-সভাপতি মির্জা সুলতান রাজাসহ অন্য সকলকে রেখে বিপ্লবী সৈনিকদের সাথে বেরিয়ে আসেন। মেজর জলিল ও আ. স. ম. রব পরের দিন মুক্তি পান। তাঁরা যথাক্রমে ময়মনসিংহ ও রাজশাহী কারাগার থেকে ঢাকা এসে পৌঁছেন ৯ নভেম্বর।

এদিকে, ৭ নভেম্বর ভোর থেকে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সাহায্য সংস্থার সাদা গাড়িগুলোতে করে একদল সৈনিক ও মাদ্রাসা হোস্টেল থেকে নিয়ে আসা কিছু ছাত্র এবং কয়েকটি দল সিপাহী-জনতার মাঝে বিশৃঙ্খল আচরণ করছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল সুবেদার মেজর সারোয়ারের চালানো ট্যাঙ্ক। এই সারোয়ার ১৫ আগস্টের বঙ্গবন্ধু হত্যার অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিল। খন্দকার মোশতাকের ফ্রেমে বাঁধানো ছবিতে হঠাৎ করে শহর ছেয়ে গেল। সেই ছবি নিয়ে এই দলটি বিক্ষিপ্তভাবে মোশতাকের পক্ষে উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিচ্ছিল। শহীদ মিনারে উপস্থিত বিপ্লবী জনতা শান্তিপূর্ণভাবে এ সমস্ত উস্কানিমূলক তৎপরতা ও বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করে। শহীদ মিনারে ভোর থেকেই বিপ্লবী গণবাহিনীর সদস্য, সাধারণ সৈনিক, জাসদ-ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগের কর্মী সমর্থকদের উদ্যোগে মাইকে বিপ্লবের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

সম্পর্কে অনবরত বক্তৃতা ও শ্লোগান চলছিল। একটু আগে সদ্য কারাগার থেকে বেরিয়ে আসা শ্রমিক নেতা মোহাম্মদ শাহজাহান মাইকে এসে ঘোষণা দেন এরপর গণমিছিল শুরু হবে এবং সে অনুযায়ী বক্তব্য দিতে শুরু করেন। কিন্তু খন্দকার মোশতাকের ছবি বহনকারী একটি সামরিক জীপ থেকে হঠাৎ করে গুলিবর্ষণ করে সমাবেশটিকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়। ৫

কর্নেল তাহের জিয়াকে দিয়ে আর একবার সৈনিকদের ১২ দফা দাবি অনুমোদন করিয়ে নিতে চেষ্টা চালান। সকাল ১১ টার সময় দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সদর দফতরে এক সভা হয়। জিয়া ভবিষ্যত কর্মপন্থা ঠিক করার উদ্দেশ্যে আলোচনার জন্য এ সভা ডাকেন। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জেনারেল ওসমানী, জেনারেল খলিল, বিমান বাহিনীর প্রধান তোয়াব, এম এইচ খান, মাহবুবুর আলম চাষী এবং কর্নেল আবু তাহের। তাহেরকে এ সভায় ডাকা হয় এ জন্য যে, সিপাহী বিপ্লবের সময় তাঁর সমর্থকরা সবচেয়ে বেশি তৎপর ও সোচ্চার ছিল। সভায় প্রথম আলোচনার বিষয় ছিল, কে প্রেসিডেন্ট হবেন তা নির্ধারণ করা। মোশতাকের দিন শেষ হয়ে গেছে। তবু ওসমানী এবং চাষী চাইলেন, তাঁকেই পুনরায় প্রেসিডেন্ট করা হোক। এ সময়ে তারা জনগণের মনে উত্থাপিত একটি সাধারণ দাবিরই প্রতিধ্বনি করলেন। প্রকৃতপক্ষে সিপাহী বিপ্লবের সময় জেনারেল জিয়ার পরে খোন্দকার মোশতাকই ছিলেন একটি অংশের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। জেনারেল খলিল এবং আবু তাহের এটার বিরোধিতা করলেন। জিয়া নিজে গত কয়েক মসে মোশতাকের কার্যকলাপে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যখন শান্তভাবে বিচারপতি সায়েমের নাম প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রস্তাব করলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয় হয়, সায়েমই পেসিডেন্ট হিসাবে বহাল থাকবেন। সভার সিদ্ধান্ত জিয়ার মত অনুযায়ী গৃহীত হলো না। এর আগেই তিনি সি.এম.এল.এর (চীফ মার্শাল ল এডমিনিষ্ট্রেটর, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক) পদ নিয়েছেন। কাজেই তিনি ভাবলেন, বিপ্লবের নেতা হিসাবে তিনি অবশ্যই এই পদে বহাল থাকবেন। কিন্তু জেনারেল খলিল সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন, প্রেসিডেন্টের উপর কারও থাকা ঠিক নয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বললেন, প্রেসিডেন্টেরই সি.এম.এল.এ হওয়া উচিত। তাহের খলিলের বক্তব্য সমর্থন করলেন। কাজেই প্রেসিডেন্ট সায়েম একই সঙ্গে সি.এম.এল.এ নিযুক্ত হলেন। জেনারেল জিয়া অপর দুই বাহিনী প্রধানের সাথে উপ-সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হলেন। জিয়া এই হেনস্তা নীরবে সহ্য করলেন। কিন্তু এই একটি কারণে তিনি জেনারেল খলিলকে কোন দিন ক্ষমা করতে পারেননি। সভায় অন্য যেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো এর মধ্যে ছিল, দ্রুত গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। মুক্তির ব্যাপারে জাসদ সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল। কারণ তাদের দলের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ এবং অসংখ্য কর্মী এ সময়ে জেলে বন্দী ছিলেন। সভায় কর্নেল তাহের সিপাহীদের ১২ দফা দাবি উত্থাপন করলেন। কিন্তু সভায় উপস্থিত কেউই দাবির প্রতি সমর্থন জানালেন না। তাহের এই অপমান ভুললেন না।

৮ নভেম্বর বায়তুল মোকাররমের আগের ঘোষণা মোতাবেক জাসদ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক জোট, কৃষক লীগ ও বিপ্লবী গণবাহিনীর যৌথ উদ্যোগে সভা হবার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ছাত্রজনতার একটি মিছিল ৪টার দিকে সভাস্থলে পৌছায়। ঠিক তখনই উপস্থিত পুলিশ বাহিনী মিছিলের উপর আচমকা গুলিবর্ষণ করে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। ছাত্রলীগের সভাপতি আ. ফ. ম. মাহবুবুল হককে দু'জন বিশেষ গুপ্তচর পুলিশ তাড়া করে জিপিও পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং গুলিবর্ষণ করে। সাথে সাথে তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয়। ছুটির দিন থাকা সত্ত্বেও সচেতন চিকিৎসকদের ত্বরিৎ ব্যবস্থায় মাহবুব নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।৭

এ ঘটনার পর পরই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সৈনিকরা সামরিক জীপে করে সভায় যোগদানের জন্য বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে হাজির হয়। তখন পুলিশ বাহিনী স্যালুট করে সরে যায়। সভা যথারীতি চলে। সভা শেষে মিছিল বের হয়ে শহীদ মিনারে শেষ হয়।

শহীদ মিনার, বায়তুল মোকাররমসহ অভ্যুত্থানের পর থেকে সকল ঘটনায় জাসদ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, অভ্যুত্থান তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও কর্নেল তাহের পরিচালিত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা ও গণবাহিনী জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা করে। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর সেনানিবাসেও সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়। ৮ নভেম্বর রাত থেকে বিদ্রোহী সৈনিকরা অফিসার হত্যা শুরু করে। এই বিদ্রোহে অন্তত বারোজন অফিসার নিহত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আক্রোশের বশবর্তী হয়ে অফিসারদের হত্যা করা হয়। মেজর করিম, ক্যাপ্টেন আনোয়ার ও লেঃ মুস্তাফিজকে হত্যা করা হয়। মেজর আজিম ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য বিমানে উঠতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় তাঁকে হত্যা করা হয়। মেজর মহিউদ্দিন, ক্যাপ্টেন খালেক ও লেঃ সিকান্দার উত্তেজিত সিপাহীদের হাতে নিহত হন। এই অন্তর্ঘাতমূলক হত্যাকাণ্ডে সেনাবাহিনীতে ব্যাপক বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। অফিসাররা তাঁদের পরিবারবর্গসহ সেনানিবাস ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে থাকেন। সেনাবাহিনীর কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। জিয়া সিনিয়র অফিসারসহ সেনা সদরে কঠোর প্রহরায় অবস্থান করতে থাকেন এবং অফিসারদের ইউনিট ব্যারাকে অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। পরদিন ৯ নভেম্বর জিয়া গ্যারিসন সিনেমা হলে সমবেত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বলেন যে, কোন অফিসারকে হত্যা করার আগে তাঁকে প্রথম হত্যা করতে হবে। কারণ তিনিও একজন অফিসার। আর যদি সৈন্যরা তাঁর আদেশ মানেন তাহলে কোন অফিসারকে হত্যা করা চলবে না। অস্ত্রাগারে অস্ত্র জমা দিতে হবে। উপস্থিত সৈন্যরা জিয়ার এই ভাষণে অস্ত্রসমর্পণে রাজি হয়। জিয়া অফিসারদের উদ্দেশ্যে অনুরূপ বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'ডোন্ট রান এওয়ে লাইক কাওয়ার্ড ইফ ইউ রান দে উইল চেজ ইউ। বিহেভ লাইক অফিসারর্স এ্যান্ড সেভ দি নেশন।'

অপরদিকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত আ.স.ম. আবদুর রব, মেজর জলিল ও মোহাম্মদ শাহজাহান সৈনিকদের অস্ত্র জমা না দিতে আহ্বান জানিয়ে শ্রেণী সংগ্রামের ডাক দেন। কর্নেল তাহের সৈনিকদের বারো দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র জমা না দেয়ার নির্দেশ দেন সুতরাং কর্নেল তাহেরের বাহিনী জিয়ার জন্য বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, কর্নেল তাহের সমাজের যে পরিবর্তন সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশের জনগণ তথা বিদ্রোহী সৈনিকরা সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। সাধারন সৈনিকদের মধ্যে জিয়ার জনপ্রিয়তা থাকায় তাঁর দেশপ্রেমমূলক উদাত্ত আহ্বানের ফলে সেনানিবাস প্রায় শান্ত হয়ে পড়ে। ব্যাটম্যান প্রথা বিলোপ ও কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধিতে বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। জিয়া যখন ২৩ নভেম্বর রাতে বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দিচ্ছিলেন 'আমি রাজনীতিক নই-আমি সৈনিক—আমরা কোন বিশৃংখলা কোন রক্তপাত চাই না।' তখন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী রব, জলিল, হাসানুল হক ইনু এবং কর্নেল তাহেরের বড় ভাই ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফ খানকে গ্রেফতার করে। পরদিন ২৪ নভেম্বর সকালে তাহেরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস এম হল থেকে গ্রেফতার করা হয়।

দু'দিন পর কর্নেল তাহেরকে মুক্ত করার জন্য একটি নাটকীয় ঘটনা ঘটে।

তাহেরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ভারতীয় হাইকমিশনারকে জিম্মি হিসেবে আটকের প্রচেষ্টা চালায় জাসদের একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ। অপারেশনে কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই সাখাওয়াতও অংশ নেয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার-এর প্রহরারত পুলিশের গুলিবর্ষণে তাহেরের ছোট ভাইসহ চারজন নিহত হয়। * আর হাইকমিশনার সমর সেন তাঁর হাতে গুলিবিদ্ধ হন। ব্যর্থ হয় পরিকল্পনাটি।

জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দলের দশ হাজার সদস্য কারারুদ্ধ হন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতর বিশেষ টাইব্যুনালে ২১ জুন ১৯৭৬ কর্নেল তাহেরের বিচার শুরু হয়। কর্নেল তাহেরের সঙ্গে মোট ৩৩ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের নেতৃবৃন্দ ও বিশজন বিদ্রোহী সৈনিক অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৭ নভেম্বরের ঘটনায় তাহেরের পুরো পরিবারই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মামলায় তাহেরের দু'ভাইকে (আবু ইউসুফ খান, ওয়ারেছাত হোসেন বেলাল) বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাহেরের ভাই আনোয়ার হোসেন বেকসুর খালাস পান। ২৬ নভেম্বর ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে মারা যান তাহেরের ভাই সাখাওয়াত হোসেন বাহার।

কর্নেল তাহের যে অপরাধ করেছিলেন সেই অপরাধের জন্য প্রকাশ্য আদালতে তাঁর বিচার হতে পারত। কিন্তু তা না করে কারাগারে তাঁর গোপন বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। তাহেরের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে, তাহের বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য সিপাহীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই

* নিহত চারজনের ছবি অ্যালবাম-এ দেয়া হলো

বৈধ সরকার বলতে খালেদ মোশারফের চারদিনের সরকারকে বোঝায় এবং এই বিদ্রোহ সংঘটিত করে তাহের জিয়াকে মুক্ত করেছিলেন। তাহেরের দুর্ভাগ্য, যে বিদ্রোহের মাধ্যমে জিয়াকে তিনি শুধু মুক্তই করেননি ক্ষমতাসীন করেছেন, সেই বিদ্রোহের জন্য তাঁকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হলো। তাহেরকে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য আইনসম্মতভাবে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়নি। যেদিন বিচার শুরু হয় কেবল সেদিনই তাঁকে অভিযোগনামা দেয়া হয় এবং তার আগে তাঁকে আইনজীবীদের পরামর্শ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি।৮

কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে পরিচালিত সিপাহী বিদ্রোহটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিদ্রোহের প্রথম থেকেই তা ছিল ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যরাও সঠিকভাবে বিদ্রোহের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। কারণ এদেশের সৈনিকদের রাজনীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। একটি সদ্য যুদ্ধবিধস্ত স্বাধীন পুনর্গঠিত সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল তারা। তারা ছিল সাধারণ কৃষক নিম্নবিত্ত সমাজ হতে আগত। আর এই বিদ্রোহে প্রথম থেকেই অফিসারদের অন্তর্ভুক্তি ছিল না। বিদ্রোহের সময় থেকেই সিপাহীরা মনে করেছে বিপ্লব হলো অফিসার হত্যা। এছাড়া বিদ্রোহের পরে কর্নেল তাহেরের উচিত ছিল যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া। এ বিদ্রোহে যেহেতু অফিসারদের সংযুক্ত করা যায়নি সেহেতু বিদ্রোহের পরেই প্রয়োজন ছিল তাদের একটা গভর্নমেন্ট গঠন করা, ক্ষমতা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়া এবং রেডিওতে নেতা হিসাবে ঘোষণা দিয়ে তাহেরের নিজেই বক্তৃতা করা। তাহলে জনগণও জানত কর্নেল তাহেরই তাদের নেতা; জিয়া নন। ১৫ আগস্টের পরের গভর্নমেন্টের লোকজনদের সঙ্গে শলাপরামর্শ বা মিটিং এর মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে গভর্নমেন্টের ফর্ম করা ছিল এ অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। এ জন্যই ১৫ আগস্টের পরের গভর্নমেন্টের লোকজন ছিনতাই করে নেয় বিদ্রোহটি এবং ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয় এ বিদ্রোহ। খালেদ মোশারফের অভ্যুত্থানের পর খালেদ মোশারফ যে রকম ভুল করেছিলেন তাহেরের ভুলও ছিল অনেকটা সে রকমেরই।

খালেদ মোশারফ অভ্যুত্থান করে সেনাবাহিনী চীফ অফ স্টাফ জিয়াকে বন্দী করলে সারা ক্যান্টনমেন্টেই ঘটনাটি ফাঁস হয়ে যায়। এ কেমন কথা! আর্মি চীফ অফ স্টাফ বন্দী! খালেদ মোশারফ এবং শাফায়াত জামিলের জিয়াকে বন্দী করার এ ভুল পদক্ষেপের জন্য সকলের অলক্ষ্যেই একদিনেই জিয়ার জনপ্রিয়তা ক্যান্টনমেন্টে আকাশচুম্বী হয়ে যায়। প্রতিটি সৈনিকের সহানুভূতি জিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়। এর জন্য জিয়াকে কিছুই করতে হলো না। সারা ক্যান্টনমেন্টে একটি কথাই সৈনিকদের মুখে মুখে ফিরলো—'জিয়া বন্দী', 'চীফ অব স্টাফ বন্দী'। অফিসারদের এসব কার্যকলাপ কোন সৈনিকেরই পছন্দ হয় নি। ৪ নভেম্বর থেকে জাসদ ও মুসলিম লীগের বিলিকৃত লিফলেটগুলোতে খালেদ মোশারফকে দেশদ্রোহী, ভারতের দালাল, বিশ্বাসঘাতক হিসাবে আখ্যাযিত করায় সাধারণ সৈনিকেরা খালেদ মোশারফের উপর প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঘটনা জিয়ার পক্ষেই যায়। তাই ৭ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের অভ্যুত্থানের সময় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্য (যার পরিমাণ তুলনামূলক খুব কমই ছিল) সৈনিক-

অফিসাররা ব্যতীত সকল সৈনিক অফিসারই মনে করেছে বিদ্রোহটি সংগঠিত হয়েছে জেনারেল জিয়ার অনুগত সৈনিক কর্তৃক এবং তাঁকে বাঁচাবার জন্যই। তাই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার অল্প কিছু সংখ্যক সৈনিক অফিসারদের তাহেরের পক্ষের শ্লোগান চাপা পড়ে যায় জিয়ার পক্ষের শ্লোগানের জন্য। আর সুযোগ বুঝে বিদ্রোহের নেতা সেজে বসেন জিয়া নিজেই এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তাহেরের পক্ষের অভ্যুত্থান হাইজ্যাক হয়ে চলে যায় জিয়ার পক্ষে।

২৪ নভেম্বর তাহেরকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। গ্রেফতার করার দু'সপ্তাহের মধ্যেই জিয়া তাহেরকে রাজশাহী জেলে স্থানান্তরিত করার আদেশ দেন। স্থলপথে যাতায়াত ঝুকিপর্ণ হবে ভেবে ৬ ডিসেম্বর হাতকড়া পরানো তাহেরকে হেলিকপ্টারে করে রাজশাহীতে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজশাহীর কারাগারে শুরু হয় তাহেরের নিঃসঙ্গ জীবন। পরবর্তী ছ'মাস ধরে তিনি ভাগ্য জানার অপেক্ষায় রইলেন। ইতিমধ্যে তাহের বিপ্লবের যে শক্তি উন্মোচন করেছিলেন জিয়া তা দমনের কাজে নিয়োজিত হন। বেঙ্গল ল্যান্সার-এর মতো আরও কয়েকটি ইউনিটকে ভেঙ্গে দেয়া হয়। অন্যদিকে মার্চে চট্টগ্রাম আর এপ্রিলে বগুড়া সেনানিবাসে সৈনিকদের মধ্যেকার গোলযোগ শক্ত হাতে দমন করা হয়।

২২ মে '৭৬-এ কর্নেল তাহেরকে হেলিকপ্টারে করে রাজশাহী থেকে ঢাকায় আনা হয়। কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হয়। সংবাদপত্রের লোকজনও জানতে পারলো না কি হতে যাচ্ছে। ১৫ জুন এক সরকারি ঘোষণায় জানা যায় যে, ১নং বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করা হয়েছে। এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন কর্নেল ইউসুফ হায়দার। তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন একজন পুনর্বাসিত অফিসার। আবার রক্ষণীশলও বটে। কার বিচার হবে সরকারি ঘোষণায় এর কোন উল্লেখই ছিল না। তবে ঘোষণায় যে আইনের উল্লেখই করা হয় তা বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার আওতায় পড়ে। ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই সরকার নিয়ন্ত্রিত 'দ্য বাংলাদেশ টাইমস' পত্রিকার পিছনের পাতায় ছোট্ট করে একটি আইন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এতে এগারজন লোককে ২১ জুনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল-এর সামনে হাজির হতে আদেশ দেয়া হয়, অন্যথায় তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার পরিচালিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

এই এগারোজনের মধ্যে প্রথমজন ছিলেন জাসদের অন্যতম নেতা সিরাজুল আলম খান। বাকি দশজনের মধ্যে সাতজনই ছিলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য।

দৈনিক 'ইত্তেফাক' একটু সাহস করে অঘোষিত নিউজ-ব্লাকআউটের বিরুদ্ধে যেয়ে 'ষড়যন্ত্র মামলার শুরু?' এই শিরোনামে এক ইঙ্গির একটি সংবাদ প্রকাশ করে। ইত্তেফাক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে সেনাসদনে জরুরী তলব করা হয়। তাঁকে সাবধান করে দেয়া হয় যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের কাজ করলে তাঁকে গ্রেফতার করা হবে। কি হতে যাচ্ছে তা যারা বোঝার এ খবর থেকে ঠিকই বুঝে নিয়েছিলেন।৯

প্রখ্যাত সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলৎস তখন ঢাকায়। তিনি মামলা চালাকালে এর সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে কিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার বর্ণনা তাঁর 'বাংলাদেশ দি আনফিনিশড্ রিভল্যুশন' গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া তিনি ওই গ্রন্থে মামলার বিভিন্ন দিকও আলোচনা করেছেন। লরেন্স লিফশুলৎস তাঁর 'বাংলাদেশ দি আনফিনিশড রিভল্যুশন' (অনুবাদ ঃ মুনীর হোসেন; অসমাপ্ত বিপ্লব তাহেরের শেষ কথা) গ্রন্থে লেখেন—

'বর্তমান লেখক মে মাসের দিকে ঢাকায় পৌছান বাংলাদেশে চলমান সঙ্কট সম্বন্ধে রিপোর্ট করার জন্য। ইতিমধ্যে ভারত ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে গঙ্গার স্রোত ঘুরিয়ে দেয়ায় বাংলাদেশে পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। বাংলাদেশে আসার কিছুদিন পরই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেনাবাহিনী আর জাসদের পরিচিত সূত্র থেকে জানতে পারি ৬৯-এ শেখ মুজিবের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পর দ্বিতীয় চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক মামলা শুরু হতে যাচ্ছে।

তাহের ছাড়া আরও তেত্রিশ জনকে বিচারের জন্য তলব করা হয়। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর বাইশ জন সদস্য ছিল। বেসামরিক আসামীদের সবাই ছিলেন কারা-অন্তরীণ জাসদ নেতা। এঁদের মধ্যে ছিলেন—জাসদ সভাপতি এম. এ. জলিল, সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব, কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু, শ্রমিক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান, ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডঃ আখলাকুর রহমান এবং ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ওয়েভ'-এর সম্পাদক কে বিএম মাহমুদ। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উঁচু হলদে দেয়ালের ভিতর একুশে জুন বিচার শুরু হয়। এ দেশের ইতিহাসে এর আগে আর কখনও কোন মামলা এভাবে জেলের ভিতরে অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের ভিতরে এই বিচারের খবর সম্বন্ধে পূর্ণ ব্ল্যাক আউট আরোপ করা হয়। আসামী পক্ষের উকিলদের সবাইকে বিচারে কার্যবিবরণী গোপন রাখার ব্যাপারে শপথ নিতে হয়। কারাগারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল অভূতপূর্ব। প্রতিটি প্রবেশ পথে বালুর বস্তার পিছনে আড়াল নিয়ে সদা প্রস্তুত সেনা। মনে করা হয় কোর্টে যাবার পথে যদি গোলমাল বাধে সেই ভয়েই কর্তৃপক্ষ বিচারটা জেলের ভিতরেই করার সিদ্ধান্ত নেয়।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের লোহার দরজাগুলো খুলে গেল। মামলার প্রথম দিন মামলার পোশাকে সজ্জিত ত্রিশ জন ব্যারিস্টার ভিতরে ঢুকলেন। বন্ধ হয়ে গেল ভারি প্রবেশ দ্বার। সেদিন নিয়তি বড় নিষ্ঠুর পরিহাস করেছিল। এমন এক সময়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হলো যখন অস্ত্রের মুখে এবং শুধুমাত্র অস্ত্রের মুখে পরপর তিনবার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। উপরন্তু খালেদ মোশারফের সহযোগি অফিসার যাঁরা ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান জড়িত ছিলেন, যাঁদের সরকারিভাবে ভারতীয়-চর বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, তাঁদের অনেককেই ইতিমধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার শাফায়াত জামিল। অথচ যখন তাঁরা চার দিনের

জন্য ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন খালেদ মোশারফও তাঁর প্রধান সহযোগি এই শাফায়াত জামিল মিলে জিয়াকে গৃহবন্দী করেছিলেন। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, যাঁরা তিন তারিখের জিয়া বিরোধী অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিলেন তাঁরাই ছাড়া পেলেন আর যাঁরা সাত তারিখে সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াকে মুক্ত করেছিলেন তাঁদেরই জীবন নিয়ে দাঁড়াতে হলো আসামীর কাঠগড়ায়। একুশে জুন ট্রাইব্যুনালের প্রথম অধিবেশনের পর এক সপ্তাহের বিরতি দেয়া হয়। সরকার পক্ষের যে মামলা সাজাতে ছয়মাস সময় লেগেছিল সেই মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বিবাদী উকিলদের সময় দেয়া হলো মাত্র এক সপ্তাহ। অন্তরীণ থাকাকালীন সময়ে অভিযুক্তরা আত্মীয়-পরিজনের সাথে দেখা করা ও আইনগত পরামর্শ পাবার সুযোগ প্রার্থনা করেন, যা সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়। ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু হবার পর পরই এই সংবাদদাতা হংকং-এর ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ, বিবিসি ও দি গার্ডিয়ান (লন্ডন)-এ খবর পাঠান, সেন্সরশীপের জন্য ঢাকা থেকে এ রিপোর্টগুলো সরাসরি পাঠানো সম্ভব হয়নি। ব্যাঙ্ককের যাত্রী জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে করে রিপোর্ট নিয়ে যান ও পরে থাইল্যান্ড থেকে তা সরাসরি পাঠানো হয়। এভাবেই ঢাকাবাসীরা এই মামলার ব্যাপারে প্রথম সংবাদ পান বিসিসি বাংলা বিভাগের মাধ্যমে। এই সংবাদদাতা চুয়াত্তর সালের গোটা এক বছর ধরেই বাংলাদেশ থেকে রিপোর্ট করে আসছেন। আটাশে জুন আবারও মামলা হলো শুরু। সেদিন আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধান দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে।

প্রধান প্রসিকিউটর এটিএম আফজাল আর ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান কর্নেল ইউসুফ হায়দারসহ অন্যদের ছবি তুলছি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তারা আমাকে বাধা দিলেন। আমাকে বলা হলো— এ বিচার অনুষ্ঠানের কার্য বিবরণী রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার অন্তর্গত এবং আমি কোন কিছুরই ছবি তুলতে পারব না। আমি তখন বললাম, এক বছরের বেশি সময় ধরে আমি বাংলাদেশে কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু এ ধরনের কোন নিয়মের কথা তো কখনও শুনিনি। আমি এরপর বেশ জোর দিয়েই বললাম যে, তাঁদের যদি ইচ্ছা থাকে আমাকে এই মামলার ছবি তোলা ও এর রিপোর্ট করা থেকে নিবৃত্ত করাবার তাহলে অবশ্যই তথ্য মন্ত্রণালয়ের লিখিত নির্দেশ দেখাতে হবে। অন্যথায় আমি আমার সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করে যাব। তখন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে পুলিশ অফিসার তাঁর ছবি তুলতে যাই। ভদ্রলোক হাত দিয়ে মুখ ঢেকে দৌড়ে সরে যান।

এরপর সেদিনের বিরতির জন্য আমি কারাগারের গেটের সামনে দু'ঘণ্টা ধরে একা একা অপেক্ষা করতে থাকি। কেন এ বিচার এত গোপনীয়তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে সরকারী বক্তব্যের জন্য আমি ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের কাছ থেকে কিছু শোনার আশায় ছিলাম। কিন্তু সেদিন এগারোটার সময় আমাকে গ্রেফতার করে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ করা হয়। আমি যে ছবিগুলো তুলেছিলাম তার ফিল্ম

আমাকে ফিরিয়ে দিতে বলা হয়। আমাকে অন্তরীণকারী লেফটেন্যান্ট ও পুলিশ কর্মকর্তাদের আমি সরাসরি জানিয়ে দিই যে, স্বেচ্ছায় আমি ফিল্ম ফিরিয়ে দেব না। এরা তখনই জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা-এনএসআই ও সামরিক আইন সদরে টেলিফোন করেন। এক ঘণ্টার মধ্যেই ঘটনা মিটমাটের জন্য দশজন অফিসার এসে হাজির হন। শামিম আহমদে নামে পরিচয়দানকারী এনএসআই-এর একজন কর্মকর্তা আমার কাছে জানতে চান কেন আমি তাহেরের এই মামলার ব্যাপারে এত উৎসাহী? আমি তখন বললাম যে, গোপন রাজনৈতিক বিচার তা স্ট্যালিন, ফ্রাঙ্কো বা জিয়া যে-ই করুন না কেন আমাকে সমান উৎসাহী করে তোলে। আমি আরও বললাম, মুজিবের হত্যাকারী ছয়জন মেজরকে ধরে যদি আজ খালেদ মোশারফ কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে বিচার বসাতেন কিংবা খালেদ আজ জীবিত থাকলে জিয়া যদি তাঁকে বিচারে আনতেন তাহলেও আমি একইভাবে আমার কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসতাম। জিয়া তাহেরকে এমন এক বিচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত করেছেন যেখানে ভীত উকিলদের গোপনীয়তার ব্যাপারে শপথ নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। কাজেই সাংবাদিক হিসাবে আমি আমার কর্তব্য পালন করেই যাব; আমি বুঝতে পারি না সাধারণ মানুষের এসব ঘটনা জানাতে অসুবিধা কোথায়। এ সময় শামিম আমার কাছ থেকে ক্যামেরাটা কেড়ে নিয়ে একজন টেলিকুম্যনিকেশন অফিসারের হাতে দেন। আমেরিকান অফিস অব পাবলিক সেফটি প্রোগ্রামের অধীনে এই অফিসারটি কয়েক বছর আগেই নিউইয়র্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। এই যুবক তখন ক্যামেরা থেকে ফিল্ম খুলে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে সামরিক আইন সদর দপ্তর থেকে একটা টেলিফোন আসে। একজন আর্মি মেজর বললেন যে, সরকারের পক্ষে একজন বিদেশী সংবাদদাতাকে আটকে রাখাটা কিছুটা বিব্রতকর হতে পারে। সেদিন সন্ধ্যায় আমি এই বিচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তারের মাধ্যমে আরেকটি সংবাদ পাঠাই। তার অফিস আমার সংবাদ গ্রহণ করেছিল ঠিকই কিন্তু সেটি আর পাঠানো হয়নি। পরদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি বাসায় ফিরে এসে পাঁচ জন স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসারকে অপেক্ষারত দেখতে পেলাম। তাঁরা জানালেন, আমাকে আবারও গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাঁদের কাছে নির্দেশ ছিল আমাকে যেন সরাসরি বিমান বন্দরে নিয়ে প্রথম ফ্লাইটে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তী ফ্লাইটের গন্তব্যস্থল ছিল ভারত। ভারত থেকে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থার আমলে আমাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। তখন ভারতে কড়া সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়েছিল। বিদেশী সাংবাদিকরা কেউই তা মেনে চলতে উৎসাহী ছিলেন না। কাজেই আমিই একমাত্র সাংবাদিক নই যাকে ভারত থেকে বহিষ্কার করে সম্মানিত করা হয়েছিল। বহিষ্কৃতদের তালিকায় আমি ছিলাম শেষ ব্যক্তি মাত্র। আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের লোকদের বুঝাতে চেষ্টা করালাম যে, ভারত থেকে ইতোমধ্যেই আমাকে একবার বহিষ্কৃত হবার কারণে তাঁরা আমাকে আর সেদেশে পাঠাতে পারেন না। শেষমেষ আমেরিকান দূতাবাসের হস্তক্ষেপের ফলে আমাকে ব্যাঙ্ককের জন্য পরবর্তী ফ্লাইট না পাওয়া পর্যন্ত তিনদিন গৃহবন্দী করে রাখা হয়। পহেলা জুলাইতে আমাকে

থাইল্যান্ডে ডিপোর্ট করা হয়। তাহেরের বিচার অনুষ্ঠানের উপর এটাই ছিল শেষ স্থানীয় ও বৈদেশিক সংবাদ সূত্র। এটিও বন্ধ হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ এবারে আঁটসাট গোপনীয়তার মধ্যে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে থাকল।

এরপর আরও সতেরো দিন ধরে বিচার চলে। তাহের প্রথম দিকে এই ট্রাইব্যুনালকে বিচারের নামে প্রহসন করার সরকারি কায়দা বলে অভিষিক্ত করে বিচার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে অস্বীকৃতি জানান।

তাহের আরও দাবি করেন যে তাঁর বিচার করতে হলে সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্য থেকে বিচারকদের প্যানেল গঠন করতে হবে। ইউসুফ হায়দারের মতো লোকেরা যারা মুক্তিযুদ্ধে কোন অংশই নেয়নি। তাদের দিয়ে বিচার করা চলবে না। কিন্তু পরে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে কোন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এতে যোগ দিলেন না। তাহেরের উকিলরা অবশ্য শেষে তাঁকে ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থিত হতে রাজি করান। প্রাথমিকভাবে তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, বিচার অনুষ্ঠান কোন রকম জোর জবরদস্তি বা প্রভাব ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে। পরে তাঁরা যখন জানতে পারলেন যে, ট্রাইব্যুনালের কাজ শুরু হওয়ার আগেই তাহেরের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই তাদের করার ছিল না। ১৭ জুলাই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ইউসুফ হায়দার বিচারের রায় ঘোষণা করেন। তাহেরের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ দেয়া হলো।

পরদিন সরকারি নির্দেশবলে সংবাদপত্রগুলোতে বিচারের ওপর সরকারি বক্তব্যই শুধু প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অবজার্ভার-এর শিরোনাম ছিল 'তাহের টু ডাই'। মামলার ওপর বাংলাদেশী প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত ওটাই ছিল একমাত্র খবর। বিচারশেষে ওই খবর যেন ছিল নিয়তির বিধান। প্রেসিডেন্ট সায়েমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আপিল করা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। সায়েম সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতি। পাঁচবছর আগে সায়েম গুরুশাস্তি ও সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বিবাদীর অধিকারের ওপর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল নামে জনৈক ব্যক্তির ওপর আরোপিত মৃত্যুদণ্ডাদেশ তিনি খারিজ করে দেন। আইনগত সিদ্ধান্তের উদাহরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এর যে তাৎপর্য তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিরান্ডা ডিসিশানের সাথে তুলনীয়। সায়েম এই যুক্তি দেখান যে, একেবারে শেষ মুহূর্তে বিবাদী পক্ষের উকিল নিয়োজিত হওয়ায় মামলায় সঙ্গতভাবে সমর্থিত হবার ব্যাপারে বিবাদীর অধিকার সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়েছে। সায়েম লিখেছিলেন, ফৌজদারী নিয়মের বিধি অনুযায়ী ফৌজদারী আদালতে আনীত একজন বিবাদীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে একজন আইনজ্ঞের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থন করার। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার জন্য আইনজ্ঞের সাথে সাক্ষাত ও আইনজ্ঞকে তাঁর কেস সাজাবার জন্য উপযুক্ত সময় দেয়াও এই অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। গুরু অপরাধে অভিযুক্ত

একজন অপরাধীর জন্য একেবারে শেষ মুহূর্তে একজন উকিল নিয়োগ লিগ্যাল রিমেমব্রেন্স ম্যানুয়াল (১৯৬০)-এর দ্বাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারকে শুধুমাত্র লংঘনই করে না, সেই সাথে এর মাধ্যমে দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত উদার সুবিধাসমূহের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে ফৌজদারী বিধির ৩৪০তম সেকশনে বর্ণিত অধিকার থেকেও অভিযুক্তকে বঞ্চিত করা হয়। কাজেই এরকম একটি বিচারানুষ্ঠান সঠিক আইনসিদ্ধ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়নি বলে ধরতে হবে এবং সেক্ষেত্রে নতুন বিচারের প্রয়োজন।

তাহেরের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী শুরু না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে কোন উকিলের পরামর্শ নিতে দেয়া হয়নি। অথচ সায়েম যিনি বিচারপতি থাকাকালীন সময়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন, পর্যাপ্তভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে আইনের নামে কাউকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া যাবে না, তিনিই দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তাহেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখলেন। তাহেরের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার একদিনের মধ্যেই সায়েম তাঁর সিদ্ধান্ত নেন।

প্রধান প্রসিকিউটর এটিএম আফজালকে এই বিচারের পর ঢাকার হাইকোর্টে বিচারপতির পদ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। অনেকটা ছাপোষা ধরনের চরিত্রের অধিকারী জনাব আফজাল তাঁর সহকর্মীদের কাছে বলেন যে, মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনে তিনি নিজেই সবচেয়ে বেশি অবাক হন। তিনি আরও দাবি করেন যে, একজন প্রসিকিউটর হিসাবে তিনি কখনও মৃত্যুদণ্ড দাবি করেননি। তাঁর মতে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত ছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাহেরকে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় তার জন্য তাঁকে মৃত্যু দেয়া সম্ভব ছিল না, দেশে সে ধরনের কোন আইন-ই ছিল না। তাহেরের ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার দশদিন পর আইন মন্ত্রণালয় এই অসঙ্গতি দূর করে। একত্রিশে জুলাই আইন মন্ত্রণালয় সামরিক আইনের ২০তম সংশোধনী ধারা জারি করে, এর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা বাহিনীতে কোন ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার-এর অপরাধের শাস্তি ঘোষণা করা হয় মৃত্যুদণ্ড।

লন্ডন থেকে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর প্রধান কার্যালয় থেকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির কাছে জরুরী আপিল করা হয় তাহেরকে ক্ষমার জন্য। সামরিক আইনের আওতায় জেলের ভিতরে গোপনে অনুষ্ঠিত একটি বিচার জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকারের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানের পর্যায়ে পড়ে না। সর্বোচ্চ আইনগত কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করার অধিকারসহ ফৌজদারী আদালতে আইনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ করা যেতে পারে। এই ছিল এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তারবার্তার বিবরণ। এরা তাহের ও অন্যান্য জাসদ নেতাদের জন্য নতুন করে বিচার অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। বিশে জুলাই সায়েমের কাছে এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর আপিল পৌঁছায়। বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলার রায় ঘোষণা করা হয় ১৭ জুলাই ১৯৭৬ বিকাল তিনটার সময়। রায়ে কর্নেল তাহেরকে

মৃত্যুদণ্ড, মেজর জলিল ও আবু ইউসুফ খানকে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য মৃত্যুদণ্ড বাদ দিয়ে যাবৎ জীবন কারাদণ্ড ও সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত অন্যান্য ১৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড এবং বাকি ১৬ জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। তাহের শত অনুরোধ সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন। তাহেরের পক্ষে তাহরের স্ত্রী লুৎফা তাহের রাষ্ট্রপতির কাছে মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফের আবেদন জানান। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তা প্রত্যাখ্যান হয়।

মামলা চলাকালীন সময়ে কর্নেল তাহের ট্রাইব্যুনালের কাছে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সায়েম, তিনজন উপ সামরিক আইন প্রশাসক এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানীকে সাক্ষী হিসাবে হাজির করার জন্য আবেদন করেন। তাঁর এ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৭ জুলাই ফাঁসির রায় ঘোষণার পরদিন ১৮ জুলাই কারাগার থেকে কর্নেল তাহের পরিবারের কাছে এক দীর্ঘ চিঠিতে রায় সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।* আসামী পক্ষের উকিল হিসাবে অভিযুক্তদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন প্রয়াত খ্যাতনামা আইনজীবী আতাউর রহমান খান, জুলমত আলী খান, কে জেড আলম, প্রয়াত এ্যাটর্নি জেনারেল এডভোকেট আমিনুল হক, জিনাত আলী, এ কে মুজিবুর রহমান, মহিউদ্দিন, সিনিয়র আইনজীবী এডভোকেট সিরাজুল হক, গাজীউল হক, আবদুল মালিক, আবদুর রউফ, ব্যারিস্টার কাজী শাহাদাৎ হোসেন, আবদুল হাকিম ও শামসুর রহমান। প্রয়াত আতাউর রহমান খান ও জুলমত আলী যৌথভাবে সকল অভিযুক্তের পক্ষে ওকালতি করেন।

রায় ঘোষণার মাত্র ৫ ঘণ্টার মধ্যে প্রচণ্ড তাড়াহুড়া করে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান মামলার সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে বঙ্গভবনে যান। বঙ্গভবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ব্যক্তিদের নিয়ে এরপর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শুরু হয় রাত আটটার দিকে। বৈঠকে আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সচিবকে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে মৌখিক আদেশ দেয়া হয় পুনর্বিবেচনাটি এমনভাবে সম্পন্ন করার জন্য যাতে করে দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত সবার শাস্তিকেই সমর্থন জানানো হয় এবং বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের শাস্তি কোন অবস্থাতেই না কমানো হয়। পুনর্বিবেচনার এ রিপোর্টটি জমা দেয়ার সময় বেধে দেয়া হলো পরদিন ১৮ জুলাই, ১৯৭৬। দিনটি ছিল রবিবার, তৎকালীন সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উক্ত সচিবের পক্ষে অফিস টাইমের পর রাত আটটার মিটিং শেষে বাসায় এসে এত বড় ও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলার এতজন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বিস্তারিত পরীক্ষা করে সে ব্যাপারে আইনের বা নিজস্ব দৃষ্টিতে কোন মতামত প্রদান করা সম্ভব ছিল কি না? অতিমানব না হলে উত্তরে নিশ্চিতভাবেই বলা যায়— না তা সম্ভব ছিল না।

---

* পরিশিষ্ট-১ এ তাহেরের সম্পূর্ণ চিঠিটি দেয়া হলো

উক্ত সচিব কাজেই কৌশলী ভাষায় তাঁর পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) রিপোর্টটি লিখেন এমনভাবে 'The evidence as analized by the tribunal would justify the conviction of the accused.'

(ট্রাইব্যুনাল যেভাবে অভিযোগগুলো বিচার করেছে তাতে করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত শাস্তিগুলো যথার্থ বলেই মনে হয়)। অর্থাৎ তিনি ভাষার মারপ্যাঁচে নিজস্ব মতামত প্রদানের ব্যাপারটি এড়িয়ে যান। অবশ্য তারপরেও তিনি সুপারিশ করেছিলেন ৭ নভেম্বর নায়ক হিসাবে এবং উত্থাপিত অভিযোগগুলোর আলোকেই কর্নেল তাহেরের শাস্তি কমিয়ে দেয়া হোক। কিন্তু তার এ সুপারিশ পরবর্তীতে আরকটি মিটিং করে বাদ দিয়ে দেয় সরকার। ১৮ জুলাই রবিবার এ রিপোর্ট জমা দেবার পর রাষ্ট্রপতি সায়েম তাহেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ও মেজর জলিল এবং আবু ইউসুফ খানের যাবজ্জীন কারাদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। পরদিন সংক্ষিপ্ত করে সংবাদটি প্রচারিত হয়।

এ মামলায় সাক্ষী দিয়েছিল সাতজন। এরা প্রত্যেকেই ছিল সহ অভিযুক্ত (Coaccused)। সরকার থেকে ক্ষমা করে দিয়ে এদেরকে রাজসাক্ষী করা হয়। এদেরকে ক্ষমা প্রদর্শনের কাজটিও খুবই আশ্চর্যজনকভাবে সমাধা করা হয়। ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাত্র একদিন পর ১৫ জুন তারিখে এদেরকে ক্ষমা করে রাজসাক্ষী করা হয়। মজার ব্যাপার হল সাক্ষীরা যে ফরমে ক্ষমার আবেদন করেছিল, সেগুলোর গঠন (Format) ছিল একেবারে একই রকম। সাধারণত সাক্ষীদের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করার জন্য (Collaborate) নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষদর্শী (Independence Witness) থাকে। এ মামলার ক্ষেত্রে এ বিধানটি উপেক্ষা করা হয় প্রকাশ্যে। রাজসাক্ষীদের ব্যাপারটি ছিল একটি সাজানো ও হাস্যকর ব্যাপার। মামলা চলাকালীন একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। মামলার এক পর্যায়ে রাজসাক্ষীদের একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় সাক্ষ্য প্রদান করেছিল ষড়যন্ত্রটি কারা সংঘটিত করেছে সে ব্যাপারে। তার মতে, ষড়যন্ত্রকারীদের একজন হলেন—ডঃ আখলাকুর রহমান (ইনিও অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন) জেরার এক পর্যায়ে তাকে ডঃ রহমানকে চিহ্নিত করতে বলা হলে সে উদভ্রান্তের মতো এদিক ওদিক তাকাতে থাকে, শেষ পর্যন্ত ডঃ রহমানকে সে চিহ্নিতই করতে পারেনি। অথচ ডঃ রহমান তখন সামনের মঞ্চে দাঁড়ানো।

৩ জুলাই ১৯৭৬-এ আসামী পক্ষের আইনজীবী ফখরুল আলমকে (এর সাক্ষ্য দিয়েই বিচার কাজের সূচনা হয়) বিস্তারিতভাবে জেরা করার জন্য ট্রাইব্যুনালের কাছে প্রার্থনা রাখলেও ট্রাইব্যুনাল সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে দেয়। সাক্ষীর জেরা সম্পর্কিত এ সিদ্ধান্ত European Conventional Human Rights-এর ধারা ৩-এর (ঘ) অনুচ্ছেদ এবং International Convinent on civil and political rights ১৯৬৬-এর ধারা ১৪ (৩)-এর অনুচ্ছেদ (ঙ)-এর সুস্পষ্ট পরিপন্থী। আন্তর্জাতিক মান্য এ আইনগুলোতে বলা হয়েছে যে, 'যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইন বিরোধী অভিযোগ উত্থাপিত হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির ন্যূনতম অধিকার থাকবে তার বিরুদ্ধে

অভিযোগগুলো পরীক্ষা করার ও সাক্ষী আনার। ঠিক সে রকমভাবে—যেমনভাবে তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগে এবং সাক্ষী আনা হয়েছে।১০

জেলকোড ১৯১৯ অনুযায়ী প্রিজন সুপারিনটেন্ডেন্ট ওয়ারেন্ট পাবার পর ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার জন্য যে দিনটি নির্ধারণ করবেন সেই দিনটি ওয়ারেন্ট পাবার দিন হতে ২১ দিন আগে বা ২৮ দিনের পরে হতে পারবে না। অর্থাৎ ওয়ারেন্ট পাবার ২১ দিনের আগে কোনক্রমেই মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা সম্ভব নয়। কর্নেল তাহেরের বেলায় জেলকোডের এ আদেশটিও মানা হয়নি। ১৮ জুলাই ১৯৭৬-এ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডাদেশ চূড়ান্তভাবে বহাল থাকার সিদ্ধান্ত হবার পর মাত্র তিন দিনের মধ্যে ২১ জুলাই ভোর রাতে কর্নেল তাহের বীরোত্তমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। মৃত্যুর পর বিশেষ সামরিক প্রহরায় ছাউনি তুলে একুশ দিন কর্নেল তাহেরের কবরে পাহারা রাখা হয়। কর্নেল তাহেরের স্ত্রী লুৎফা তাহের একটি চিঠির মাধ্যমে তাহেরের মৃত্যুর আগে শেষ মুহূর্তের বর্ণনা দিয়েছেন।* লরেন্স লিফশুলৎস-এর 'বাংলাদেশ দি আনফিনিশড্ রিভল্যুশন' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এ চিঠি। চিঠিতে তিনি বলেন—

১৯৭৬ সালের ২০ জুলাইয়ের রাতে তাহেরকে জানানো হলো, ২১ তারিখে ভোর চারটায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। তিনি এই নির্দেশ মেনে নিলেন এবং যাঁরা এই তথ্য নিয়ে এসেছিল তাঁদের ধন্যবাদ জানালেন। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবে তিনি তাঁর রাতের খাবার খেলেন। যখন এক মৌলভী তাঁর পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুরোধ জানালেন তখন তিনি বললেন, 'আমি কোন পাপ করিনি। আপনাদের সমাজের কোন পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি, আমি পুরোপুরিভাবে সৎ ছিলাম এবং এখনও আছি। আপনারা যেতে পারেন। আমি এখন ঘুমাবো'। এরূপ খুব শান্তভাবে তিনি ঘুমুতে গেলেন। রাত ৩টার দিকে তাঁকে জাগানো হলো। তিনি কতটুকু সময় পাবেন জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি নিজেই সেভ করলেন। দাঁত পরিষ্কার করলেন এবং গোসল সারলেন। সেখানে উপস্থিত লোকজন তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলো। তিনি তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি চাই না, তোমরা আমার পবিত্র শরীর স্পর্শ কর'। গোসলের পর তিনি তাঁর জন্য চা তৈরি করতে বললেন। আমরা তাঁকে যে আম দিয়েছিলাম, সেটা কাটতে বললেন। তারপর নিজেই তাঁর জামা-কাপড়-জুতা পরে নিলেন। তিনি খুব চমৎকার একটি শার্ট গায়ে দিলেন, হাতঘড়ি পরলেন এবং সযত্নে চুল আঁচড়ালেন। এরপর তিনি উপস্থিত সবাইকে নিয়ে চা, আম এবং সিগারেট খেলেন। তাঁর সাহস দেখে উপস্থিত সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। এরকম একজন লোকের মৃত্যুদণ্ড কেউ মেনে নিতে পারছিল না। তিনি তাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, 'তোমরা এত মুষড়ে পড়ছ কেন? হাসো। আমি হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে চাই। মৃত্যু আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।' তাঁর কোন ইচ্ছা আছে কি-না জানতে চাওয়া হলো। তিনি বললেন, 'আমার মৃত্যুর বদলে আমি সাধারণ

* মিসেস লুৎফা তাহেরের সম্পূর্ণ চিঠিটি পরিশিষ্ট-৩ এ দেয়া হলো

মানুষের সুখ চাই। এরপর তাহের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার হাতে কি আর সময় আছে?' তারা বলল, আর কিছুটা সময় তিনি পাবেন। তিনি তখন বললেন, 'তাহলে আমি একটা কবিতা আবৃত্তি করব।' তিনি একটি কবিতা পড়লেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি এখন তৈরি। চলো যাই, তোমাদের কাজ শেষ করো।' তিনি সামনে এগুলেন এবং নিজেই ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে নিলেন।'

তাহেরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকরি হওয়ার মধ্য দিয়েই দেশের ইতিহাসে সামরিক ট্রাইব্যুনালের প্রথম শিকারে পরিণত হন কর্নেল তাহের। আর এরই মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশে প্রথম সামরিক আদালতের সূচনা হয়। ইতিহাসের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা এই যে, যে বৈধ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার অপরাধে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেয়া হয় সে বৈধ সরকার ছিল খালেদ মোশারফ সরকার। আর এই সরকারের পতনের মাধ্যমেই ক্ষমতায় আসেন জেনারেল জিয়া। এই সরকারের পতনকে তিনি 'সিপাহী বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন এবং একে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেন!

ফাঁসির পূর্বে তাহের যে কবিতাটি আবৃত্তি করেন সেটি হলো—

"জন্মেছি সারা পৃথিবীকে ঝাঁকুনি দিতে
দিয়েই গেলাম।
জন্মেছি সারা দেশটাকে কাঁপিয়ে তুলতে,
কাঁপিয়ে গেলাম।
জন্মেছি তোদের বুকে পদচিহ্ন আঁকবো বলে
এঁকেই দিলাম।
জন্মেছি তোদের শোষণের হাতটুকু ভাঙ্গবো বলে
ভেঙ্গে দিলাম।
জন্মেছি বঞ্চিতদের ক্ষেপিয়ে তুলবো বলে
ক্ষেপিয়ে গেলাম।
জন্মেছি কাঙ্গালদের মুক্তির সুর শোনাবো বলে
শুনিয়ে গেলাম।
জন্মেছি ভণ্ডদের ভবিষ্যতের মাথা খাবো বলে
খেয়েই গেলাম।
জন্মেছি মৃত্যুকে পরাজিত করবো বলে
করেই গেলাম।
জন্মেছি জীবনটাকে বিলিয়ে দেবো বলে,
বিলিয়ে দিলাম।

সব কালো আইন ভাঙ্গতে হবে বার্তা পেলাম,
চৈত্রের শেষে ঝড়ো বৈশাখে তাই জন্ম নিলাম।
পাপী আর পাপ থেকে দূরে থাকবো
তাই হাতে অস্ত্র নিলাম।
ইতিহাস বলবেই শোষকের মৃত্যু কবজ
আমিই দিলাম।
জন্ম আর মৃত্যুর দু'টো বিশাল পাথর
রেখে গেলাম।
সেই পাথরের নীচে শোষক আর শাসকের
কবর দিলাম।
পৃথিবী-অবশেষে এবারের মতো বিদায় নিলাম।

তথ্য নির্দেশ

১. এন্থনী ম্যাসকারেনহ্যার্স-এ লিগেসি অব ব্লাড
২. প্রাগুক্ত
৩. 'বাংলাদেশ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সঙ্কট' মেজর রফিকুল ইসলাম পিএসসি
৪. প্রাগুক্ত
৫. সাক্ষাৎকার—বেগম লুৎফা তাহের
৬. এ লিগেসি অব ব্লাড
৭. সাক্ষাৎকার— বেগম লুৎফা তাহের
৮. বাংলাদেশ সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট
৯. এখনই সময়, কর্নেল তাহের সংখ্যা
১০. সাপ্তাহিক বিচিন্তা, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৫

পরিশিষ্ট-১

কর্নেল তাহেরের সংক্ষিপ্ত জীবনী

লেঃ কর্নেল আবু তাহের ১৪ নভেম্বর ১৯৩৮ সালে আসামের বদরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ ভাই ৩ বোনের সংসারে তাহের ছিলেন তৃতীয় সন্তান। বাবা মহিউদ্দিন আহমেদ। মাতা আশরাফুন্নেছা। সিলেট এম. সি. কলেজ থেকে তাহের বি. এ. পাশ করেন। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে ফল প্রকাশ পর্যন্ত তাহের চট্টগ্রামের মিরসরাই এর দূর্গাপুর হাইস্কুল-এ শিক্ষকতা করেন। বি. এ. পাশ করে তাহের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে এম এ ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে সমাজ বিজ্ঞানে এম. এ. প্রথম পর্ব শেষ করে সিদ্ধান্ত নেন সেনাবাহিনীতে যোগ দিবেন। সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ১৯৬০ সালে কমিশন লাভ করেন। প্রথমে পদাতিক বাহিনী পরবর্তীতে ১৯৬৫ সাল থেকে পাকিস্তানের দুধর্ষ কমাণ্ডো বাহিনীর 'স্পেশাল সার্ভিস গ্রুপের' এলিট অফিসার হিসেবে তাহের কর্মরত থাকেন। '৬৫ সালের পাকভারত যুদ্ধে তাহের শিয়ালকোর্ট সেক্টরে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে মারাত্মকভাবে আহত হন। '১৯৬৭ হতে '৬৯ পর্যন্ত তাহের চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কমান্ডো ব্যাটলিয়নে অবস্থান করেন। ৭ আগস্ট ১৯৬৯ সালে তাহের এক সময়ের ইডেন কলেজের ছাত্রী সংসদের সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা লুৎফা বেগমকে বিবাহ করেন। ১৯৭০ সালে তিনি কোয়েটার স্টাফ কলেজে সিনিয়র টেকনিক্যাল কোর্সে যোগ দেন।

তাহেরই ছিলেন একমাত্র বাঙালী অফিসার যাকে 'মেরুণ প্যারাস্যুট উইং' প্রদান করা হয়েছিল। তিনি ১৩৫ স্ট্যাটিক লাইন প্যারাজ্যাম্পের কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। এ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন শিক্ষাকোর্সে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করা হয়। জর্জিয়া কলম্বিয়া রেঞ্জার ট্রেনিং কম্যাণ্ড তাঁকে 'রেঞ্জার টেপ' এ ভূষিত করেছিল। ১৯৬৯ এর শেষের দিকে নর্থ কেরোলিনার স্পেশাল ফোর্সেস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে তাহেরকে অনার্স ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এছাড়াও ২৫২ বার স্কাইজাম্প করার দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারীও ছিলেন তিনি। উল্লেখ্য সে সময়ে কোনো এলাইট অফিসার এতোগুলো কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হননি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেনিং এর পর তাঁর সার্টিফিকেটে লিখা হয়, 'এ যোদ্ধা বিশ্বের যে কোন জায়গায়, যে কোন সেনাবাহিনীর সাথে, যে কোন অবস্থায় যুদ্ধ করতে সক্ষম'।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী বাহিনী বাঙালী জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে গণহত্যা শুরু করে। তাহের তখন পাকিস্তানের কোয়েটায় 'স্কুল অব ইনফেন্ট্রি এণ্ড টেকটিক্সে' সিনিয়র টেকনিকেল কোরে অংশ নিচ্ছিলেন। ২৬ মার্চ কোয়েটা সামরিক অফিসার ক্লাবে একজন পাঞ্জাবী অফিসার শেখ মুজিব সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করায় তাহের তার প্রতিবাদ করলে তাঁকে বন্দী করা হয়। কয়েকবার পালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর ২৫ জুলাই মেজর তাহের, মেজর মঞ্জুর, মেজর জিয়াউদ্দিন, ক্যাপ্টেন

পাটোয়ারী এবং একজন সিপাহীসহ এ্যাবোটাবাদ থেকে ভারতের দেবীগড় সীমান্ত অতিক্রম করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধে ১১ নং সেক্টরের সেক্টর কম্যাণ্ডার হিসেবে তাহের নিযুক্ত হন। ১৪ নভেম্বর তাঁর তেত্রিশতম জন্মদিনে কামালপুর আক্রমণে পাকিস্তানী বাহিনীর একটি শেলের আঘাতে তিনি তাঁর বাম পা হারান। সমগ্র মুক্তিযুদ্ধে বীরোত্তমপূর্ণ অবদানের জন্য তাহের স্বাধীনতার পর বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত হন। যুদ্ধের মধ্যেই মেজর তাহের স্বাধীন বাংলা সরকার কর্তৃক লেঃ কর্নেল এ উন্নীত হন।

তাহেরের ভাই বোনেরাও সকলে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বড় ভাই আবু ইউসুফ সৌদি আরব থেকে ভারতে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং যুদ্ধে বীরত্বের জন্য 'বীর বিক্রম' খেতাবে ভূষিত হন। আরো দু'ভাই (ওয়ারেছাত হোসেন বেলাল ও সাখাওয়াত হোসেন বাহার) বীর প্রতীক খেতাব পেয়েছিলেন।

১৯৭২-এর এপ্রিল মাসে ভারতের পুনা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা শেষে নকল পা লাগিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর লেঃ কর্নেল তাহেরকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল করা হয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ৪৪ তম বিগ্রেডের অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় ২২ সেপ্টেম্বর '৭২ সালে লেঃ কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী হতে পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের পর তাহের নবগঠিত (তৎকালীন) রাজনৈতিক দল জাসদের সঙ্গে যুক্ত হন। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সপরিবারে শহীদ হন। ৭ নভেম্বর লেঃ কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে তাহেরকে এস. এম. হল থেকে গ্রেফতার করা হয়। ১৫ জুন '৭৬ সালে তাহের সহ ৩৩ জনের বিরুদ্ধে বিশেষ সামরিক আদালত গঠন করা হয়। ১৭ জুন বিচার শুরু হয়। ১৭ জুলাই ১৯৭৬ সালে সামরিক আদালতে তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়, ২১ জুলাই ভোর ৪টায় কার্যকর করা হয় মৃত্যুদণ্ড।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায়

মৃত্যুদণ্ড
লেঃ কর্নেল আবু তাহের (অবঃ) বীর উত্তম

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য মৃত্যুদণ্ড বাদ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

১. মেজর এম এ জলিল (অবঃ)
২. ফ্লাইট সার্জেন্ট আবু ইউসুফ খান বীর বিক্রম

১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ২০ হাজার টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

১. মেজর জিয়াউদ্দিন

১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

১. আ. স. ম আবদুর রব
২. হাসানুল হক ইনো
৩. ডঃ আনোয়ার হোসেন

৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

১. সিরাজুল আলম খান
২. কর্পোরাল আলতাফ হোসেন
৩. কর্পোরাল শামসুল হক

৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

১. নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ জালালুদ্দিন (অনুপস্থিত)
২. হাবিলদার এম এ বারেক (অনুপস্থিত)

৩. রবিউল আলম

৪. মিসেস সালেহা বেগম

৫. নায়েক সিদ্দিকুর রহমান

১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০ টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড

১. হাবিলদার আবদুল হাই মজুমদার

২. কর্পোরাল এ মজিদ

বেকসুর খালাস

১. ডঃ আখলাকুর রহমান

২. আনোয়ার সিদ্দিক

৩. জনাব মহিউদ্দিন (অনুপস্থিত)

৪. নায়েক সুবেদার বজলুর রহমান

৫. মাহমুদুর রহমান মান্না

৬. ওয়ারেছাত হোসেন বেলাল

৭. মোহাম্মদ শাহজাহান

৮. সাংবাদিক কে. বি. এম. মাহমুদ

৯. শরীফ নূরুল আম্বিয়া (অনুপস্থিত)

১০. হাবিলদার সুলতান আহম্মদ

১১. নায়েক এ বারী

১২. সার্জেন্ট কাজী রকুন উদ্দিন

১৩. নায়েক সুবেদার এ লতিফ আখন্দ

১৪. নায়েক শামসুদ্দিন

১৫. সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলাম।

বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবিনামা

যে ১২ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সাধারণ সৈনিকরা ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে সামিল হয়েছিল। দাবিগুলো ছিল :

১. আমাদের বিপ্লব নেতা বদলের জন্য নয়। এই বিপ্লব গরিব শ্রেণীর স্বার্থের জন্য। এতোদিন আমরা ছিলাম ধনীদের বাহিনী। ধনীরা তাদের স্বার্থে আমাদের ব্যবহার করেছে, ১৫ আগস্ট তার প্রমাণ। তাই এবার আমরা ধনীদের দ্বারা বা ধনীদের স্বার্থে অভ্যুত্থান করিনি। আমরা বিপ্লব করেছি। আমরা জনতার সঙ্গে একত্র হয়েই বিপ্লবে নেমেছি। আমরা জনতার সঙ্গে থাকতে চাই। আজ থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হবে গরিব শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার একটি গণবাহিনী।

২. অবিলম্বে রাজবন্দিদের মুক্তি দিতে হবে।

৩. রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না।

৪. অফিসার ও জোয়ানদের ভেদাভেদ দূর করতে হবে। অফিসারদের আলাদাভাবে নিযুক্ত না করে সামরিক শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী সামরিক বাহিনী থেকেই পদমর্যাদা নির্ণয় করতে হবে।

৫. অফিসার ও জোয়ানদের একই রেশন ও একই রকম থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. অফিসারদের জন্য আর্মির কোনো জোয়ানকে ব্যাটম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা চলবে না।

৭. মুক্তিযুদ্ধ, গণঅভ্যুত্থান এবং আজকের বিপ্লবে যে সমস্ত দেশপ্রেমকি ভাই শহীদ হয়েছেন তাদের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. ব্রিটিশ আমলের আইন কানুন বদলাতে হবে।

৯. সমস্ত দুর্নীতিবাজদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। বিদেশে যারা টাকা জমিয়েছে তাদের টাকা বাংলাদেশে ফেরত আনতে হবে।

১০. যে সমস্ত সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের বিদেশে পাঠানো হয়েছে তাদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. জোয়ানদের বেতন ৭ম গ্রেড করতে হবে এবং ফ্যামিলি একোমডেশন ফ্রি দিতে হবে।

১২. পাকিস্তান ফেরত সামরিক বাহিনীর লোকদের ১৮ মাসের বেতন দিতে হবে।

[কর্নেল আবু তাহের বা জাসদ এই ১২ দফা দাবিনাম প্রণয়ণ করে নি। সৈনিক সংস্থা তা তৈরি করেছিলো। জাসদ তাতে সামান্যই সম্পাদনা করেছে]

বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনালে ষড়যন্ত্র মামলার রায়

অবসর প্রাপ্ত লেঃ কর্ণেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ডঃ মেজর জলিল ও অপর ১ জনের যাবজ্জীবনঃ মেজর জিয়াউদ্দীন, রব, সিরাজুল আলমসহ ১৪ জনের বিভিন্ন মেয়াদী কারাদণ্ড ও জরিমানা

বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল গতকাল (শনিবার) ষড়যন্ত্র মামলায় রায় প্রদান করেছেন। এই ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার উৎখাতের চেষ্টা এবং সশস্ত্র বাহিনীতে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের দায়ে তথাকথিত গণবাহিনী ও অধুনালিপ্ত জাসদের কতিপয় নেতার বিচার করা হয়। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২১ (ক) ধারা এবং ১৯৭৫ সালের ১নং সামরিক আইনের ১৩ নং বিধি মোতাবেক এই বিচার সমাধা করা হয়।

বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনাল অন্যতম আসামী লেঃ কর্ণেল (অবসর প্রাপ্ত) আবু তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন। অপরদিকে মেজর (অবসর প্রাপ্ত) এম. এ. জলিল ও লেঃ কর্ণেল (অবসর প্রাপ্ত) তাহেরের ভাই জনাব আবু ইউসুফ খানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

সেনাবাহিনী পলাতক অফিসার মেজর জিয়াউদ্দিন আহমদকে ১২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

অধুনালুপ্ত জাসদের নেতা জনাব এ.এস.এম. আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব রসায়নের প্রভাষক জনাব ডঃ আনোয়ার হোসেন এবং অপর একজন জাসদ নেতা জনাব হাসানুল হক ইনুকে ১০ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

অধুনালুপ্ত জাসদ নেতা জনাব সিরাজুল আলম খান, কর্পোরেল আলতাফ হোসেন এবং কর্পোরেল শামসুল হককে ৭ বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।

ট্রাইব্যুনাল ষড়যন্ত্র মামলায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরও শাস্তি প্রদান করেছেন। নায়েক সুবেদার মোহাম্মদ জালালুদ্দিন (অনুপস্থিতিতে বিচার), হাবিলদার এম এ বারেক (অনুপস্থিত), বরিউল আলম, মিসেস সালেহা বেগম এবং নায়েক সিদ্দিকুর রহমান। তাঁদের প্রত্যেককে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫,০০০ টাকা করে জরিমানা করা

হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। হাবিলদার আবদুল হাই মজুমদার ও কর্পোরেল এ. মজিদকে এক বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। নিম্নলিখিত অভিযুক্তদের বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে ঃ

ডঃ আখলাকুর রহমান, জনাব আনোয়ার সিদ্দিক, জনাব মহিউদ্দিন (অনুপস্থিতে বিচার)। নায়েক সুবেদার বজলুর রহমান, জনাব মাহমুদুর রহমান মান্না, জনাব ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, জনাব কে. বি. এম. মাহমুদ, শরীফ নূরুল আম্বিয়া (অনুপস্থিতিতে বিচার), হাবিলদার সুলতান আহম্মদ, নায়েক এ. বারী, সার্জেন্ট কাজী রকুনউদ্দিন, নায়েক সুবেদার এ লতিফ আখন্দ, নায়েক শামসুদ্দীন এবং সার্জেন্ট সৈয়দ রফিকুল ইসলাম।

মামলার বিবরণে বলা হয়, মেজর (অবসর প্রাপ্ত) এম. এ জলিল, জনাব এ এস এম আবদুর রব, জনাব সিরাজুল আলম খান, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, জনাব হাসানুল হক ওরফে ইনু, লেঃ কর্নেল (অবসর প্রাপ্ত) আবু তাহের, মেজর জিয়াউদ্দিন আহমদ, (পলাতক) প্রমুখ জাসদ নেতা আরও অনেকের যোগসাজশে বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা, হাঙ্গামার মাধ্যমে সরকার উৎখাত এবং ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের জনগণ ও সেনাবাহিনীর গৌরবদীপ্ত বিপ্লবের সুফল সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র করেছেন। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী সশস্ত্র বাহিনীকে ধ্বংস করে তথাকথিত গণবাহিনীকে এর স্থলাভিষিক্ত করার উদ্দেশ্যে লেঃ কর্নেল (অবসর প্রাপ্ত) আবু তাহের এবং তাঁর কতিপয় সহযোগী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্ররোচিত করেছিলেন বা প্ররোচনা দানের চেষ্টা করেছিলেন।

তাঁরা রাজনৈতিক ক্লাস পরিচালনা করতেন, আপত্তিকর বইপত্র ও ইশতাহার এবং অর্থ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিতরণ করতেন। নিয়মিত বাহিনীর অবসান ও ধ্বংস ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁরা সেনাবাহিনীর স্কুলে জাসদ ও কাদের সিদ্দিকীর তথাকথিত গণবাহিনীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

এটাও দেশপ্রেমিক জনসাধারণের কাছে সুবিদিত যে, জাসদের সশস্ত্র লোকেরা অদ্যবধি রাজনৈতিক খুন-খারাবী চালাচ্ছে এবং নিরীহ মানুষ খুন করছে। সীমান্তে কাদেরিয়া বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কেও তারা অবহিত আছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের পর ষড়যন্ত্রকারীরা নাশকতামূলক পন্থায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় লিপ্ত থাকে। সেসময়ের বিরাজমান পরিস্থিতিতে গণবাহিনীর তথাকথিত নেতারা ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের গৌরবময় বিপ্লবের সফলতার সকল দাবীদার সেজে বসে। কিন্তু শীঘ্রই তাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। দেশপ্রেমিক সৈনিকরা সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফকে উদ্ধার করে এবং তাঁর ডাকে অস্ত্র জমা দিযে ব্যারাকে ফিরে যায়। সেনাবাহিনীর স্বদেশ প্রেম ও শৃংখলাবোধে

পরিশিষ্ট-২

জেলখানা থেকে
স্ত্রী লুৎফা তাহের-কে পাঠানো
কর্নেল তাহেরের চিঠি

[illegible] — There is only one example of such treachery in our history and that is of Mir Jafar. [illegible] [illegible] — I have seen many small people in my life but never so smaller than you. [illegible] Fortunately for us today is not 1757. Today is 1976. We have the revolutionary soldiers — we have the revolutionary people to frustrate the evil design of a conspirator like Ziaur Rahman.

[illegible] — I am a free man. I earned my freedom through my deeds. The high walls of the jail, solitary confinement, chains in my hand can not take away my freedom.

[illegible]

A law is not a law unless it is a good law aiming at the good of the people and good of the country. So is an ordinance. This court room was prepared before the promulgation of the said ordinance. This tribunal was constituted before the promulgation of the ordinance. The ordinance was promulgated to suit and evil design of the government. It is a bad ordinance, a black ordinance. It has no legal or moral sanction. This tribunal has no moral sanction or legal sanction to try me.

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল
৯ই জুলাই, '৭৬
ভোর চারটা

প্রিয় লুৎফা,

ভোর চারটায় উঠে তোমাকে লিখছি এতে তুমি নিশ্চয়ই খুবই অবাক হয়ে যাবে। জেলখানায় এসে এটা একটি বড় পরিবর্তন। ভোর চারটায় ঘুম ভেঙ্গে যাবে। শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না। এ সময়টা লেখার কাজগুলি শেষ করি। চারটা থেকে ৭টা পর্যন্ত। তুমি তো জানো গ্রেফতারের পর থেকে আমাকে একলা রাখা হয়। ঢাকা জেলেও সে ব্যবস্থা। নানা কাজে সাহায্য করার জন্য চারজন কয়েদি দেওয়া হয়েছে। জেলখানায় এরাই আমার বর্তমান অনুগত অনুসারী। ইতিমধ্যে তাই হয়ে উঠেছে মনে হয়। আমার প্রতি এদের যত্নের বাড়াবাড়ি অনেক সময় উপদ্রব হয়ে উঠে। ব্যক্তিগত কাজগুলি করে হালিম। ১৮ বছরের ছেলে। রাজনৈতিক দলের ছেলে। অস্ত্র আইনে দেড় বছরের সাজা হয়েছে। আমার বিছানা ছাড়ার সাথে সাথেই সে উঠে বসবে। ৭টা পর্যন্ত তিন কাপ চা খাওয়া হয়ে যায়। ভোরের এই সময়টা ভালই লাগে। ঢাকা জেলে কাক ছাড়া অন্য কোন পাখি নেই। কাক ডাকা শুরু হয় ভোর পাঁচটা থেকে। জেল গেটের পাশেই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে একটি বেশ বড় জায়গায় আমাকে রাখা হয়েছে। দুটো বড় বড় কামরা। বাথরুম, কমোড রয়েছে। ভাববে না। বেড়াবার জায়গাও রয়েছে। বাগান রয়েছে। ঘরের বাইরের পানির ট্যাঙ্কে অনেকগুলি তেলাপিয়া মাছ ছেড়েছি। এদের জন্ম, জীবন, প্রেম ভালবাসা, বংশবৃদ্ধি ও জীবন সংঘাত সম্বন্ধে ইতিমধ্যে বেশ বিজ্ঞ হয়ে উঠেছি। বাগানের মাঝখানে সিমেন্ট ও পাথরের টুকরো দিয়ে আমাদের চারজন অনুসারী নিয়ে তৈরি করেছি একটি পাহাড়। এটা বেশ ভালই হয়েছে। বহুদিন থাকবে আমার ঢাকা জেলে থাকার স্মৃতি নিয়ে। বাগানটিও বেশ সুন্দর হয়ে উঠেছে।

জেলে এসে জীবন ও কর্মের বিচার করা যায় একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে। বাইরের নানা কাজে তা সম্ভব হয় না, কর্মজীবনের শুরু থেকে নানা ঘটনা আমাদেরকে নিয়ে গেছে একটি বৃহৎ দায়িত্ব ক্ষেত্রে। একটি দেশ, একটি জাতি ও সুন্দর সমাজ সৃষ্টির কাজে। একটি অবাক কর্মক্ষেত্র। দুর্বলতার কোন অবকাশই এখানে নেই। জীবনের সাধারণ দায়িত্বগুলি যা জীবনকে সাধারণ অর্থে নিশ্চিত করে ও তাকেই আকড়ে থাকার মোহ দেয়, অনেক অংশে বিভ্রান্তও করে, সেই দায়িত্বগুলিকে অবহেলা করতে হয়েছে। আমার অজ্ঞতায় আমাদের ভালবাসাকে আমি অনেক সময় সেই সাধারণ দায়িত্ব পালনের আওতায় এনেছি। অনেক ক্ষেত্রে অবহেলাও করেছি। জেলখানায় একাকী জীবনে আমাদের বন্ধনের গভীরতা আমি জানতে পেরেছি। আমার সেই অবহেলাগুলি আমাকে মাঝে মাঝে পীড়া দেয়। মনের গভীরে কি আমরা এক নই।

কোর্ট শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা সবাই সারাদিন একসঙ্গে থাকতে পারি। এটাই বর্তমানে বড় লাভ। এ কোর্টের বৃত্তান্ত খবরের কাগজে বের হলে আমাদেরকে

এখন পর্য্যন্ত কেউ জেলে আটকে রাখতে পারত না। সারা দেশের মানুষ ও সৈনিকরা ৭ই নভেম্বরের চাইতে বহু গুণ বড় আকারে বের হয়ে আসত। সরকারি সাক্ষিরাই বলেছে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য ৭ই নভেম্বরে কর্নেল তাহেরের নির্দেশে সিপাহী বিপ্লব হয়। এ সাক্ষিদের দ্বারা আমাদেরকে কোন অভিযোগে অভিযুক্ত করতে পারবে না। এ কোর্টটি একটি আজব ব্যাপার। একে কোর্ট কোন অর্থেই বলা চলে না। চেয়ারম্যানের আচরণ ও ব্যবহার একটি থানার দারোগার মত। আমরাও তাকে সে ভাবে গ্রহণ করি। তারা তাদের কাজ করে, আমরা আমাদের আলাপ আলোচনা নিয়ে থাকি। ভাইজান ভালই আছেন। জেলখানাকে ভাইজান কেমনভাবে গ্রহণ করেন সে জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত ছিলাম। ভাববার কিছুই নেই। ভাইজান আমাদের সবার জন্য একজন আসল নেতা। আনোয়ার কোর্ট শেষে আমাদেরকে তার উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা শোনায়। তবে তার কবিতা শোনার জন্য পুলিশ ও আর্মির লোকেরা ভিড় জমায়। জিয়া সুন্দরবনের ও শিকল পরা ছল গান গায়। আমাদের মধ্যে একমাত্র মহিলা সালেহা তার স্বভাবসিদ্ধ সুক্ষ্ম কৌতুকে কোর্টকে বিব্রত করে। আমরা ভাইরা ছাড়া আর সবাই কবিতা লিখতে শুরু করেছে। অনেক সুকান্ত ও নজরুল জন্ম নিয়ে কোর্ট রুমের ছোট্ট বদ্ধ ঘরে। জলিল প্রতিদিনই একটি করে কবিতা লিখছে। বাংলা ও ইংরাজীতে। বেলাল সকলের অত্যন্ত প্রিয়। জেলখানায় সবাই তাকে সমীহ করে। রব হচ্ছে আমাদের অফুরন্ত ভাণ্ডার। কার কি চাই তার দিকে তার সজাগ দৃষ্টি। মেজর জলিল আজকাল বিশেষ রাগ করে না। প্রথম দিকে একদিন বলেছিল চেয়ারম্যানকে, 'You are a Colonel or a Dummy. চেয়ারম্যান বলে, 'I am a colonel.' পরশুদিন ভাইজান বলেন, 'I fell the tribunal and the prosecution are one pice an it my staying here and engaging al lawyer is meaningless.' এভাবেই কোর্ট চলছে।

৭ই নভেম্বর আমি রক্তপাত ছাড়া যে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলাম, ধনিকশ্রেণী তা ব্যহত করে তাদের জন্য তারা একটি বৃহত রক্তপাত ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। সমাজতান্ত্রিত বিপ্লব সম্পন্ন হবেই। একে কেউ বাধা দিতে পারবে না। বেঈমান জিয়া আমাদেরকে জেলখানায় বিচার করতে বসে আরো আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করল। লাভ জনগণেরই।

আমাদের জন্য তোমরা কোন চিন্তা করবে না। কাজের মাঝেই জীবনের সার্থকতা। আমার জন্য যদি তুমি গৌরব বোধ করতে পার-তা কি যথেষ্ট নয়?

আম্মা এসেছেন কি? ডলি, জলি কেমন? আমার যিশুকে আদর দিও। সবাইকে স্নেহ দিবে। দৈনন্দিন ঘটনা দিয়ে বিষয়কে বিচার করবে না। সামগ্রিকভাবে আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

তুমি আমার অনেক আদর নিও,

তোমারই তাহের

[৯ই জুলাই ১৯৭৬, ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে স্ত্রী লুৎফা'কে লেখা তাহেরের চিঠি]

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল
১৫ই জুলাই, '৭৬

আমার আদরের লুৎফা,

তোমার পত্র পেয়েছি। আমার পূর্বপত্রখানা পড়ে তুমি হয়ত খুবই হেসেছ। তোমার কবিতাটি জলিল রেখে দিয়েছে। ও সবাইকে দেখায়। জিয়ার পত্র ও জলিলের কবিতা পেয়েছ নিশ্চয়ই। এরা সবাই আমাকে বিশেষভাবে ভালবাসে। গত কয়দিন কাটল আমাদের জনানবন্দীতে। আনোয়ার শুরু করেছে ও আমি শেষ করেছি। আনোয়ারের জবানবন্দী সবাইকে সম্মোহিত করেছিল। মেজর জলিল আড়াই ঘণ্টাকালিন বক্তব্যে যে শক্তি ও অনুরাগ প্রকাশ করে তা কেবলমাত্র একজন বিপ্লবীর কাছ থেকেই আশা করা যায়। ইনু ও মান্নার বক্তব্য অপূর্ব, ভাষা তত্ত্ব ও নৈতিকতার দিক থেকে সালেহা সবাইকে অবাক করে। ভাইজান তার গুছানো কথার শেষে বলেন,

'I am a tax payer. The officers who prepared this false case against me are mainted by me. The tribunal by now realised that how corrupt and inefficient they are. I would request the chairman of the tribunal to recommend action against them.

বেলাল ছোট কথায় বেশ সুন্দরভাবে তার মূল কথা তুলে ধরে। ট্রাইবুন্যালের নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে প্রায় ৬ ঘন্টা যাবত আমি আমার জবানবন্দি বলি। নানা বাদানুবাদে অপ্রিয় কথাও আসে। তোমাকে কয়েকটি শুনাই। ৭ই নভেম্বরে আমার ভূমিকা বর্ণনা শেষে—

If this is an act of treachery I would commit that act again and again. এক পর্যায়ে কোর্ট আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে This tribunal can neither acquit me nor punish me. I do not care for this tribunal.

জিয়ার বেঈমানী প্রসঙ্গে—This is only one example of such treachery in our history and that is of MIR JAFOR. কোর্ট একথা রেকর্ড করতে অস্বীকার করে। এতে আমাকে বলতে হয় চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে—I have seen many small people in my life but never a smaller than you. অবশেষে এ প্রসঙ্গে কোর্ট রেকর্ড করে।—Fortunately for us today is not 1957. Today is 1976. We have the revolutionary soldiers—we have the revolutionary people to frustrate the evil de-sing of a conspirator like Ziaur Rahman. জেলখানার আমাদের প্রতি ব্যবহারের কথায়—I am a free man. I earned my freedom through my deeds. The high walls of the Jail, solitary confinement, chains in my hand cannot take a way my freedom.

ট্রাইব্যুনাল প্রসঙ্গে—A law not a unless it is a good law aiming at the good of the poeple and good of the country. So is an ordinance. This court room

was prepared before the promulgation of the trial ordinance. This tribunal was constituted before the promulgation of the ordinance. The ordinance was promulgated to suit evil design of the government. It is a bad ordinance, a black ordinance. It has not legal or moral sanction. This tribunal has no moral sanction or legal sanction to try me.

ট্রাইব্যুনালের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে—'This tribunal has put to shame to what all human civilization achieved through constant endeavor from the very beginning till today.

উপসংহার ঃ I am the soul of my nation. I would urge you to be the soul of your nation—So that you may serve and protect your nation as you would like to serve and protect your soul. I warn this anti people reacationary govt. and warn this tribunal. I warn our evil gentry do not ever dare to in-timidate me do not ever dare to tempt me in doing that you will hurth the soul of your nation.

Victory to the revolution
Victory to the people
Long live Bangladesh

কোর্টের অনেক কথা শুনালাম। চাকলাদারের কাছে আনোয়ার ভাইজান ও আমার পুরো জবানবন্দী আছে।

তোমাদের আর্থিক সংকট নিরসনের জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু প্রতিদিন কোর্ট ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরান হচ্ছে বলে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তুমি বিশেষ শঙ্কিত বলে মনে হয়। জনগণের জয়যাত্রা ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই, জলিল আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমৃদ্ধ হচ্ছে। কয়দিন হল আমার সম্বন্ধে তার স্বপ্ন - 'চারদিকে হাজার হাজার উৎসাহ ভরা সৈনিকের মাঝে সাদা হাতিতে চড়ে আমি যাচ্ছি।' এরকম অবস্থাতে বেশ মজাই হয়। কিন্তু সাদা হাতি ব্রহ্মদেশ ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিকল্প ব্যবস্থা অনুযায়ী হাতির গায়ে সাদা কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে।

গতকাল ছিলাম ছয় সেলে। আনোয়ার, বেলাল ও রবিউল আমার পাশের সেলে ছিল। ভাইজান ছিলেন ২৬ সেলে। ভাইজানকে সরান হয়েছে। আমাদের কয়েকজনকে প্রতিদিনই এমনিভাবে সরান হয় যাতে বাইরে থেকে কেউ এসে সহজে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া না যায়। কি বুদ্ধি। জেলখানার ভেতর আর্মড পুলিশ আনা হয়েছে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে। সেলের সামনে বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সরকার ভীত সন্ত্রস্ত। ফল হয়েছে সবাই আমাদের আরো সম্মান করে ও ভালো চোখে দেখে।

আমি তোমাকে বোধ হয় আমার মনের কথা বোঝাতে পেরেছি। নীতু, যিশু ও মিশুর কথা ও অন্য বাচ্চাদের কথা কি আমি ভাবি না। কিন্তু ভাবনাকে একটি ভীতিকর পর্য্যায়ে নিয়ে যাবার কি প্রয়োজন। তাতে লাভই বা কি। আমাদের ভাগ্য জনগণের ভাগ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এসো, আমরা সেদিনের দিকে তাকাই যে দিনের চিত্র গাথা আমাদের চিন্তায়, ভাবনায়। জনগণের জয়যাত্রা তো শুরু হয়ে গেছে ৭ই নভেম্বর থেকে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েও কেউ আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না।

জিয়াকে আস্তাকুড় থেকে তুলে এনে তাকে দিয়েছিলাম সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, কিন্তু সে আস্তাকুড়ে ফিরে গেছে। ইতিহাস আমার পক্ষে।

আমাদের জীবনে নানা আঘাত দুঃখ এসেছে তীব্রভাবে। প্রকাশের অবকাশও নেই। ভয় যদি সেই প্রকাশ কোন সহকর্মীকে দুর্বল করে, ভয় যদি কেউ আমাকে সমবেদনা জানাতে আসে আমাকে আমার জাতিকে ছোট করে। তাই মাঝে মাঝে মন ব্যাকুল হয়। তোমাকে পেতে চাই নিবিড়ভাবে, তোমার স্পর্শ, তোমার মৃদু পরশ, আমাকে শান্ত করুক।

আমার আদর নিও।
তোমারই তাহের।

[১৫ই জুলাই ১৯৭৬-এ স্ত্রী লুৎফাকে লেখা তাহেরের চিঠি যার মধ্যে
তাহের কোর্ট সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন]

ঢাকা সেন্ট্রাল জেল
১৮ই জুলাই '৭৬ সাল

শ্রদ্ধেয় আব্বা, আম্মা, প্রিয় লুৎফা, ভাইজান, আমার ভাই ও বোনেরা,

গতকাল বিকাল বেলা ট্রাইবুন্যালের রায় দেওয়া হল, আমার জন্য মৃত্যুদণ্ড। ভাইজান ও মেজর জলিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। আনোয়ার, ইনু, রব ও মেজর জিয়া ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা। সালেহা, রবিউল ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, ৫ হাজার টাকা জরিমানা। অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড। ডঃ আখলাক, সাংবাদিক মাহমুদ, মান্নাসহ ১৩ জনকে মুক্তিদান। সর্ব্বশেষে ট্রাইবুন্যাল আমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে বেত্রাহত কুকুরের মত তাড়াহুড়া করে বিচার কক্ষ পরিত্যাগ করল।

হঠাৎ সাংবাদিক মাহমুদ সাহেব কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। আমি তাকে সান্ত্বনা দিতে তিনি বল্লেন, 'আমার কান্না সে জন্য যে, একজন বাঙ্গালী কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ড রায় ঘোষণা করতে পারল।' বোন সালেহা হঠাৎ টয়লেট রুমে যেয়ে কাঁদতে শুরু করল। সালেহাকে ডেকে এনে যখন বল্লাম, 'তোমার কাছ থেকে এ দুর্বলতা কখনই আশা করি না।' সালেহা বলল, 'আমি কাদি নাই আমি হাসছি।' হাসি কান্নায় এই বোনটি আমার অপূর্ব। জেলখানার এই বিচার কক্ষে এসে প্রথম তার সাথে আমার দেখা। এই বোনটিকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। কোন জাতি এর মত বোন সৃষ্টি করতে পারে।

সমগ্র সাক্ষী, অভিযুক্তদের শুধু একটি কথা, 'কেন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল না।' মেজর জিয়া বসে আমার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখল। জেলখানার এই ক্ষুদ্র কক্ষে হঠাৎ আওয়াজ উঠল, 'তাহের ভাই লাল সালাম।' সমস্ত জেলখানা প্রকম্পিত হয়ে উঠল। জেলখানার উঁচু দেওয়াল এই ধ্বনিকে কি আটকে রাখতে পারবে? এর প্রতিধ্বনি কি পৌঁছবে না আমার দেশের মানুষের মনের কোঠায়?

রায় শুনে আমাদের আইনজীবীরা হঠাৎ হতবাক হয়ে গেলেন। তারা এসে আমাকে বল্লেন যদিও এই ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না, তবুও তারা সুপ্রিম কোর্টে রীট করবেন কারণ সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এই আদালত তার কাজ চালিয়েছে ও রায় দিয়েছে। সাথে সাথে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করবেন বলে বল্লেন। আমি তাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলাম রাষ্ট্রপতির কাছে কোন আবেদন করা চলবে না। এই রাষ্ট্রতিকে আমিই রাষ্ট্রপতির আসনে বসিয়েছি। এই দেশদ্রোহীদের কাছে আমি প্রাণ ভিক্ষা চাইতে পারি না।

সবাই আমার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শুনতে চাইল। এর মধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল। আমি বললাম, 'আমি যখন একা থাকি তখন ভয়, লোভ-লালসা আমাকে চারিদিক থেকে এসে আক্রমণ করে। আমি যখন আপনাদের মাঝে থাকি তখন সমস্ত ভয়, লোভ-লালসা দূরে চলে যায়। আমি সাহসী হই, আমি বিপ্লবের সাহসী রূপে নিজকে দেখতে পাই। সমস্ত বাধা, বিপত্তিকে

অতিক্রম করার এক অপরাজেয় শক্তি আমার মধ্যে প্রবেশ করে। তাই আমাদের একাকিত্বকে বিসর্জন দিয়ে আমরা সবার মাঝে প্রকাশিত হতে চাই। সে জন্যই আমাদের সংগ্রাম।

সবাই একে একে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। অশ্রুসজল চোখ। বেশ কিছু দিন সবাই একত্রে কাটিয়েছি। আবার কবে দেখা হবে। সালেহা আমার সাথে যাবে, ভাইজান, আনোয়ারকে চিত্ত চাঞ্চল্য স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু তাদেরকে তো আমি জানি। আমাকে সাহস দেবার জন্য তাদের অভিনয়। বেলালের চোখ ছল ছল করছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চায়। জলিল, রব, জিয়া আমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করল। এই আলিঙ্গন অবিচ্ছেদ্য। এমনিভাবে দৃঢ় আলিঙ্গনে আমরা সমগ্র জাতির সঙ্গে আবদ্ধ। কেউ তা ভাঙ্গতে পারবে না। সবাই চলে গেল। আমি আর সালেহা বের হয়ে এলাম। সালেহা চলে গেল তার সেলে। বিভিন্ন সেলে আবদ্ধ কয়েদি ও রাজবন্দীরা অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে বন্ধ সেলের দরজা জানালা দিয়ে। মতিন সাহেব, টিপু বিশ্বাস ও অন্যান্যরা দেখাল আমাকে বিজয় চিহ্ন। এই বিচার বিপ্লবীদেরকে তাদের অগোচরে এক করল।

ফাঁসীর আসামীদের নির্দ্ধারিত জায়গা ৮ সেলে আমাকে নিয়ে আসা হল। পাশের তিনটি সেলে আরো তিনজন ফাঁসীর আসামী। ছোট্ট সেলটি ভালই, বেশ পরিষ্কার। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন জীবনের দিকে তাকাই তাতে লজ্জার তো কিছুই নেই। আমার জীবনের নানা ঘটনা আমাকে আমার জাতির সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। এর মত বড় সুখ, বড় আনন্দ আর কি হতে পারে।

নীতু, যিশু ও মিশুর কথা-সবার কথা মনে পড়ে। তাদের জন্য অর্থ-সম্পদ কিছুই আমি রেখে যাইনি। কিন্তু আমার সমগ্র জাতি রয়েছে তাদের জন্য। আমরা দেখেছি শত সহস্র উলঙ্গ, মায়া, ভালবাসা বঞ্চিত শিশু। তাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় আমরা গড়তে চেয়েছি। বাঙ্গালী জাতির জন্য উদ্ভাসিত সূর্য্যের আর কত দেরী? না, আর দেরী নেই। সূর্য্য উঠল বলে। এ দেশ সৃষ্টির জন্য আমি রক্ত দিয়েছি। সেই সূর্য্যের জন্য আমি প্রাণ দেব যা আমার জাতিকে আলোকিত করবে, উজ্জিবিত করবে-এর চাইতে বড় পুরস্কার আমার জন্য আর কি হতে পারে।

আমাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। আমি আমার সমগ্র জাতির মধ্যে প্রকাশিত। আমাকে হত্যা করতে হলে সমগ্র জাতিকে হত্যা করতে হবে। কোন শক্তি তা করতে পারে? কেউ পারবে না।

আজকের পত্রিকা এল। আমার মৃত্যুদণ্ড ও অন্যান্যদের বিভিন্ন শাস্তির খবর ছাপা হয়েছে প্রথম পাতায়। মামলার যা বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা। রাজসাক্ষিদের জবানবন্দিতে প্রকাশ পেয়েছে আমার নেতৃত্বে ৭ই নভেম্বর সিপাহী বিপ্লব ঘটে। আমার নির্দেশে জিয়াউর রহমানকে মুক্ত করা হয়। আমার দ্বারা বর্তমান সরকার গঠন হয়। এ মামলায় কাদেরিয়া বাহিনীর কোন উল্লেখই ছিল না। এডভোকেট

আতাউর রহমান, জুলমত আলী ও অন্যান্যরা যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা যেন এই মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করেন ও সমগ্র মামলাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। আমি মৃত্যুর জন্য ভয় পাই না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক, চক্রান্তকারী জিয়া আমাকে জনগণের সামনে হেয় করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। আতাউর রহমান ও অন্যান্যদেরকে বলবে সত্য প্রকাশ তাদের নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে যদি তারা ব্যর্থ হন তবে ইতিহাস তাদেরকে ক্ষমা করবে না।

তোমরা আমার অনেক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আদর নিও। বিচার ঘরে বসে জিয়া অনেক কবিতা লেখে, তারই একটি অংশ—

জন্মেছি, সারা দেশটাকে কাপিয়ে তুলতে
কাপিয়ে দিলাম।
জন্মেছি, তোমাদের শোষণের হাত দুটো ভাঙ্গব বলে
ভেঙ্গে দিলাম।
জন্মেছি, মৃত্যুকে পরাজিত করব বলে
করেই গেলাম।
জন্ম আর মৃত্যুর দুটি বিশাল পাথর
রেখে গেলাম
পাথরের নিচে শোষক আর শাসকের
কবর দিলাম
পৃথিবী—অবশেষে এবারের মত বিদায় নিলাম।

তোমাদের তাহের

[১৭ই জুলাই রায় ঘোষণার পরদিন ১৮ই জুলাই ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে পরিবারের কাছে লেখা তাহেরের শেষ চিঠি]

- **তাহেরের সবগুলো চিঠিই গোপনে আইনজীবী জিনাত আলী ও শরীফ চাকলাদারের মাধ্যমে মিসেস তাহেরের হস্তগত হয়।**

পরিশিষ্ট-৩

লুৎফা তাহেরের স্মৃতিচারণ

কর্নেল তাহেরের মৃত্যুর পর বড় ভাইজানকে লেখা চিঠি

কিশোরগঞ্জ
১৮ই আগস্ট ১৯৭৬

শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাইজান,

আপনাকে যে কি লিখব তার কিছুই ঠিক করতে পারছি না। আমি ভাবতেও পারি না তাহের আর আমার সাথে নেই। আমার জীবন সঙ্গীকে ছাড়া বাঁচার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। মনে হচ্ছে বাচ্চারা খুব কষ্ট পাচ্ছে। এতো ছোট বাচ্চা, কিছুই বুঝতে পারে না। নীতু বলে—'বাবা, কেন তুমি মরলে, তুমি আমাদের সাথে থাকলে এখনো বেঁচে থাকতে।' ওরা বুঝতেও পারে না ওরা কি হারালো। প্রতিদিন ওরা ফুল নিয়ে কবরে যায়। কবরের ওপর ফুল রেখে ওরা প্রার্থনা করে 'আমি যেন বাবার মতো হতে পারি।' যীশু বলে ওর বাবা চাঁদের দেশে ঘুমিয়ে আছে।

দুর্ভাগ্যবশত নীতু ওর বাবাকে সেই নভেম্বরে শেষ দেখে। কিশোরগঞ্জে থাকায় পরে আর দেখতে পায় নি। আমি খুবই ভাগ্যবতী। তাহের আমাকে যে পথ দেখিয়ে গেছে তা-ই আমার আসল অস্ত্র। বেঁচে থাকতে সে আমাকে বাঙালী নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সম্মান দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে আমি সারা পৃথিবীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছি। আমার সব আশাই এত কম সময়ে সে পূর্ণ করে গেল! তাহেরের বন্ধু ও সহকর্মীরা যখন আমাকে সহানুভূতি জানায়, মনে হয় তাহের এখনো এদের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, চিরদিন বেঁচে থাকবে। এরা আমার আপনজনের মতো। আমি সত্যি গর্বিত, সে মৃত্যুকে পরাজিত করেছে। মৃত্যু তাঁকে কখনো মলিন করতে পারবে না। এখানে যা ঘটেছে তার সবই আমি বর্ণনা করব :

১৭ই জুলাই শনিবার তিনটার সময় তাহেরের মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করা হয়। আমাদের পক্ষের পঁচিশজন ব্যারিস্টারসহ আমরা সবাই নির্বাক হয়ে গেলাম। সারাদেশের লোক ক্ষেপে গিয়েছিল তার কারণ সরকার পক্ষ কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। এমনকি সরকারী স্বাক্ষীরাও ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানে তাহেরের অবদানের কথা স্বীকার করে। আতাউর রহমান, জুলমত আলীর মতো বিশিষ্ট ব্যারিস্টার, আলম আর অন্যান্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা রাষ্ট্রপতির কাছে যেয়ে এই বেআইনী ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে চরম নিন্দা প্রকাশ করে। তাহের তখন ব্যারিস্টারদের বললো—'এই সেই সরকার যাকে আমি ক্ষমতায় বসিয়েছি, এদের কাছে আপনারা কিছুই

চাইবেন না।' মৃত্যুদণ্ডের রায় শুনে তাহের অট্টহাসিতে ফেটে পড়েছিল। অন্য সব বন্দীরাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাহের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললো—'জীবন যদি এভাবে বিসর্জন না দেয়া যায়, সাধারণ মানুষের মুক্তি তাহলে আর কিভাবে আসবে?' আমরা তাহেরকে বাঁচানোর সব রকম চেষ্টাই করেছিলাম। তাহের অবশ্য আমাকে লিখেছিল—'তোমার মাথা নত করোনা, আমি মরণকে ভয় পাই না। তুমি যদি গর্ব অনুভব করতে পারো তাতেই যথেষ্ট।'

১৯ তারিখ বিকালে তাহের আমাদের সবার সাথে দেখা করে। সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও উৎফুল্ল ছিল। রায় দেয়ার পর সে যা লিখেছিল আমায় তা পড়ে শোনায়। পরে আমাকে বলে—'তোমার শোক করা সাজে না, ক্ষুদিরামের পর দক্ষিণ এশিয়ায় আমিই প্রথম ব্যক্তি যে এভাবে মরতে যাচ্ছে।' আর সবাই আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেছে সেকথা তাহেরকে বললে সে বললো—'সে-কি জীবনের মায়া ফিরিয়ে আনার জন্য? আমার জীবনের দাম কি জিয়া অথবা সায়েমের জীবনের চেয়েও কম?'

সে আমাদের এত উদ্দীপনা দিয়েছিল যে আমরা সবাই হাসিমুখে বের হয়ে এসেছিলাম; তখনো কেউ জানতাম না যে এটাই আমাদের শেষ দেখা। দেশের সমস্ত শিক্ষক, রাজনীতিবিদ এমনকি বিদেশীরা পর্যন্ত সরকারের কাছে অনুরোধ করে তাহেরের মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য, কিন্তু তাহেরকে বাঁচতে দেয়ার মতো সাহস কর্তৃপক্ষের ছিল না। এরা তাই তাহেরকে সময়ের সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের সন্ধান দিয়েছে, তাঁকে অমরত্বের সুধা দিয়েছে।

ইউসুফ, বেলাল, মনু-তাহেরের সব ভাইরাই তাঁর সাথে ছিল। বিশ তারিখ সন্ধ্যায় তাহেরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে পরদিন ভোর চারটায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। সে শান্তভাবে এই খবর গ্রহণ করে ও যাদের ওপর এই খবর দেয়ার দায়িত্ব পড়েছিল তাদের ধন্যবাদ জানায়। এরপর সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় রাত্রির খাবার খেয়ে নেয়। পরে একজন মৌলভী এসে কৃত অপরাধের জন্য তাহেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুরোধ জানায়। সে তখন বলে ওঠে—'আপনাদের সমাজের কালিমা আমাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। কখনো না। আমি সম্পূর্ণ শুদ্ধ। আপনি এখন যান, আমি এখন ঘুমোবো।' সে এরপর শান্তভাবে ঘুমোতে যায়। রাত তিনটার দিকে তাঁকে ডেকে ওঠানো হয়। কতক্ষণ সময় আছে জানার পর তাহের দাঁত মাজে, সেভ করে ও গোসল করে নেয়। উপস্থিত সবাই তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। 'আমার নিষ্পাপ শরীরে তোমাদের স্পর্শ লাগুক আমি তা চাই না'—এই বলে তাহের তাদের নিবৃত্ত করে।

গোসল করার পর তাহের তাঁর জন্য চা করতে ও আমাদের দিয়ে আসা আম কেটে দিতে বলে। নিজে নিজেই সে নকল পা, জুতো আর প্যান্ট পরে নেয়। হাত ঘড়ি পরে, একটা ভালো সার্ট গাঁয়ে দিয়ে তাহের তার চুলগুলো ভালভাবে আঁচড়ে নেয়। এরপর সে আম আর চা খেয়ে নিয়ে সবার সাথে মিলে সিগারেট খেতে থাকে। একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লোকের এরকম সাহস দেখে সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। তাহের তখন

সবাইকে সান্ত্বনা জানায়- 'আপনারা হাসুন, সবাই এত বিষন্ন কেন। আমি দুর্দশাগ্রস্থদের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলাম। মৃত্যু আমাকে পরাজিত করতে পারবে না।' তাহেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় তাঁর কোন শেষ ইচ্ছা আছে কি-না, তাহের জবাবে বলে—'আমার মৃত্যুর বিনিময়ে এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি।'

এরপর তাহের জানতে চায়—'আর কোন সময় বাকি আছে কি-না?' অল্পকিছু সময় বাকি আছে জানার পর তাহের সবার সামনে একটা কবিতা আবৃত্তি করতে চায়। তাহের এরপর তাঁর কর্তব্য ও অনুভূতি নিয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে। এরপর তাহের জানায়—'আমি এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তোমরা এখন তোমাদের কর্তব্য পালন করতে পারো।' তাহের ফাঁসি-কাঠের দিকে এগিয়ে যায়। নিজেই ফাঁসির দড়ি তুলে নেয়। গলায় রশি পড়ে নেয়ার পর তাহের বলে ওঠে—'বিদায় দেশবাসী। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।' তাহের তখন তাদের বোতাম টিপতে বলে। কিন্তু কেউই সামনে এগিয়ে এলো না। তাহের তখন এদের বিদ্রুপ করে বলে ওঠে—'তোমাদের কি এই সাহসটুকুও নেই?' তখনি কেউ বোতাম টিপে দেয়—সব শেষ। তাঁর ভাইদের পরে মৃতদেহ দেখানো হয়।

সেদিন জেলখানার সাড়ে সাত হাজার বন্দীর কেউই দুপুরে ভাত খায়নি। আমাদেরকে দুপুর আড়াইটার সময় মৃতদেহ দেয়া হয়। কড়া নিরাপত্তা প্রহরার মধ্যে জেলের ভেতরে একটা গাড়ী নিয়ে গিয়ে তাতে মৃতদেহ তুলে দেয়া হয়। এরপর হেলিপ্যাড পর্যন্ত পাঁচটা ট্রাক-বাস ভর্তি নিরাপত্তা প্রহরীদের পাহারার মধ্যে মৃতদেহ একটা হেলিকপ্টারে তুলে দেয়া হয়। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার সময় পারিবারিক গোরস্তানে তাহেরকে কবর দেয়া হয়।

একটা বিশেষ ছাউনী তুলে সামরিক প্রহরীরা একুশ দিন পর্যন্ত তাঁর কবর পাহারা দিয়েছে; এরা এমনকি একজন মৃত লোককে ভয় পায়। সে আমাদের মাঝ থেকে চলে গেলেও আমাদের জন্য রেখে গেছে এক মূল্যবান উত্তরাধিকার। মানুষের প্রতি তাঁর মহান কর্তব্য পালন করতে যেয়ে তাঁকে শেষে বিষ আর মধু—এ দুটোর সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল। নিজে বিষ গ্রহণ করে আমাদের জন্য রেখে গেছে মধুময় অমৃত। যেদিকে তাকাই চারদিকে শুধু অন্ধকার দেখি : কি করব তার কিছুই বুঝতে পারি না। মনে হয় সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছি। তবুও আমি জানি আমার এই দুর্দশা চিরকাল থাকবে না। এর শেষ আসবেই আসবে। তাহেরের আদর্শ সবার আদর্শে পরিণত হয়েছে; তা দেখতে পেলেই আমি শান্তি পাব। শুধু দুঃখ এই যে সেই সুখের দিনে তাহের সেখানে থাকবে না।

—স্নেহের লুৎফা

৭ বছরের সংসার সারাজীবনের স্মৃতি

১৪ নভেম্বর। তাহেরের জন্মদিন। এমনিতেই তাহেরের সঙ্গে আমার জীবন খুবই অল্প দিনের। এরমধ্যে তাহেরের যে জন্মদিনটি আমাদের জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সেটির কথাই বলি।

১৯৭১ সালের ১৪ নভেম্বর। সেদিন ছিল ঢাকার প্রবেশদ্বার কামালপুর অপারেশনের তারিখ। তাহের বুঝেছিলেন উত্তর সীমান্তে পাকিস্তানের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ কামালপুরের পতন ঘটিয়ে কামালপুর-শেরপুর, জামালপুর-টাঙ্গাইল হয়ে ঢাকা পৌঁছা যায় সবচেয়ে দ্রুত।

(একটি কথা বলি, যুদ্ধের সময় আমি বরাবর তাহেরের সঙ্গে ক্যাম্পেই থাকতে চাইতাম। কিন্তু সঙ্গে আমার মেয়ে নীতু, তাহেরের ছোট দুই বোন ডলি, জলি এবং আরো মেয়েরা থাকাতে আলাদা থাকতাম। তবে বরাবরই ছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি)। যাই হোক কামালপুর অপারেশনেই জয়লাভ হবে এ বিষয়ে আমরা সবাই ছিলাম নিশ্চিন্ত। কারণ এর আগে তাহের সবকটি অপারেশনেই জয়ী হয়েছিল। তাহেরের সঙ্গে পরিকল্পনা হলো। ১৪ তারিখ বিকেলে আমি ওদের কাছে যাবো। বীরযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলে অপারেশনের জয় আর তাহেরের জন্মদিন পালন করবো। মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়ার জন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। খবর এলেই রওনা দেবো। এমন সময় ১৪ তারিখ দুপুর একটার দিকে বিএসএফ এর একজন সামরিক কর্মকর্তা কর্নেল রঙ্গরাজ ও তার স্ত্রী এবং একজন শিখ মেজর এসে আমাকে যুদ্ধের ভয়াবহতা বিপদাপদ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ ও শান্তনার সুরে কথাবার্তা শুরু করলেন। আমি সরাসরিই বললাম আসল কথা খুলে বলুন, আমি যে কোন ঘটনার জন্যে প্রস্তুত। তখন তাদের মুখে শুনলাম তাহের গুলিতে আহত হয়েছে। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছে। মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশনে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু তাহের আহত হওয়ায় অপারেশন স্থগিত রাখতে হয়েছে।

আমি কিন্তু তেমন উদ্বিগ্ন হইনি। কারণ আমি দেখেছি এর আগে মুক্তিযোদ্ধাদের পায়ে গুলি লেগেছে, মাসখানেক চিকিৎসার পর আবার তারা যুদ্ধে ফিরে গেছেন। তাহেরকে হেলিকপ্টারে করে বিএসএফ ফিল্ডে আনা হলো। চাদর দিয়ে তার পা ঢাকা ছিল। তখন কিন্তু তাহেরের পা ছিল না। আমি বুঝতে পারিনি। হেলিকপ্টারের ভিতর শুয়ে ছিল তাহের। চাদর সরিয়ে আমি আর দেখিনি। আসলে ওর মুখ দেখে অতোটা

বিচলিত হইনি। দেখলাম চোখ বন্ধ করে আছে। সবাই বললো এতক্ষণ ওর পুরোপুরি জ্ঞান ছিল, এইমাত্র ঘুমিয়েছে। তাহেরের দেহে জরুরি ভিত্তিতে আরেকটি অপারেশন করতে হবে তাই তাকে তখনই গৌহাটি কম্বাইণ্ড সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সঙ্গে গেলেন তাহেরের ভাই ইউসুফ। ইউসুফ ভাইয়ের দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ফলেই তাহেরের সময়োপযোগী চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছিল। সেই দিনটির কথা তাই খুবই মনে পড়ে। সেই ১৪ নভেম্বর। কোথায় তাহেরের যুদ্ধবিজয় আর জন্মদিন পালনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম, আর সেই দিনেই যুদ্ধে পা হারালো সে।

পরের দিন খবর এলো গৌহাটি যেতে হবে। তখনও কিন্তু ৭২ ঘণ্টা বিপদসীমা পার হয়নি। আমাকে ওসব জানানো হলো না। কেবল ওয়ারলেসে খবর এলো আমাকে দেখার জন্য তাহের বড়োই উদগ্রীব।

আমার মেয়ে নীতুর বয়স তখন মাত্র ৩ মাস। ওকে আমার ছোট দুই ননদ একজন ক্লাস ফাইভে আরেকজন থ্রি পড়ুয়া তাদের কাছে রেখে তাহেরের ছোট ভাই আনোয়ারকে নিয়ে গৌহাটি গেলাম। আমাদের দেখে মনে হলো তার বেদনা অনেকখানি উপশম হয়েছে। আমি বললাম দেখি কি হয়েছে? তারপর চাদর উঠিয়ে দেখলাম তাহেরের একটি পা নেই। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে ওর যে পায়ে গুলি লেগেছিল সেই পা'টিই ১৯৭১ সালের ১৪ নভেম্বর এসে পাকিস্তানী গোলায় উড়ে গেলো। বিষয়টি আমার কাছে রীতিমতো অকল্পনীয়। কিন্তু ধৈর্য্য হারাইনি। তাহেরকে বলেছিলাম—ঠিক আছে প্রাণেতো বেঁচে আছো। তাহের একমাস ঐ হাসপাতালে ছিল। ওই অসুস্থতার মধ্যেই ডাক্তার ডেকে আমাদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করার জন্যে বললেন। এই হাসপাতালে তাকে একমাস থাকতে হয়েছিল। ক্ষতস্থানে ড্রেসিঙের সময় সে নিজে তাকিয়ে থাকতেন। নিজের ঐ অবস্থাতেও আশেপাশের আহতদের সাহস যোগাতেন, খাবারের অসুবিধা তদারক করতেন। সে সময় আমার আত্মীয় আওয়ামী লীগ দলীয় এম পি জনাব আবদুস সাত্তার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিনের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহের তা গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।

পা হারিয়ে তাহেরের কিন্তু কোনো দুঃখ বা ক্ষোভ ছিল না। সব সময় বলতেন, আমার এই পা দুটোর 'চুড়ান্ত ব্যবহার' হয়েছে। একবার যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা এলেন এবং বললেন, 'স্যার আমরা যারা যুদ্ধে পঙ্গু হয়েছি তারা সকলে মিলে একটা সংগঠন করতে চাইছি, আপনি হবেন তার প্রধান।' প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়েছিলেন। 'পঙ্গু? কে পঙ্গু? দুটো পা যার আছে আমি তার চেয়েও বেশি কর্মক্ষম।'

এই মানুষটার মধ্যেই ছিল অদ্ভুত এক কোমলতা। যখন যেখানেই থাকুক আমাদের বিয়ের দিনটি ঠিক মনে রাখতো। আমাদের বিয়ে হয় ৭ই আগস্ট ১৯৬৯ সালে। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ রসায়ন বিভাগে এম এস সি পড়ছি। ও তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল। মজার ব্যাপার হলো, বিয়ের কার্ড ছাপা হয়ে যাবার পরে তাহের মেজর পদে উন্নীত হয়। বিয়ের ১৫ দিন পরেই তাহের

চিটাগাং চলে যায়। সেখান থেকে ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডি ও পেশোয়ারের মাঝামাঝি অবস্থিত আটক ফোর্টে বদলি হয়। এরমধ্যে আমি আর ইউসুফ ভাইয়ের স্ত্রী টিকাটুলিতে একটি বাসা নিয়ে থাকছি। একদিন পরীক্ষা দিয়ে বাসায় ফিরছি প্রায় সন্ধ্যায়। হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন আমার চোখ ধরে ফেললো। তাকিয়ে দেখি, হঠাৎ ঝড়ের মতোই তাহের উপস্থিত। আমার বিস্ময়ভরা দৃষ্টি দেখে বললেন, তোমাকে সারপ্রাইজ দিলাম। তারপর অনেক কথার পরে বললেন ... ... তোমার জন্য দুটো খবর আছে। একটা সুসংবাদ একটা দুঃসংবাদ। সুসংবাদ হলো আমি উচ্চতর কমাণ্ডো ট্রেনিংয়ে ৬ মাসের জন্য আমেরিকা যাচ্ছি। এটা অত্যন্ত কস্টলি ট্রেনিং এবং একাই বাঙালি অফিসার মনোনীত হয়েছি। আর দুঃসংবাদ হলো, আবার আমাদের বিচ্ছেদ হবে। যে কয়েকদিনের জন্য তিনি এসেছিলেন, পুরো সময়টা আমরা একত্রে কাটিয়েছি। প্রায় বিকেলে টিকাটুলির রাস্তায় হাঁটতাম। তখন তাহের আমার হাত ধরে হাঁটতো। আমি বললাম—তুমি কি এটা প্যারিসের রাস্তা পেলে? তাহের ভিতরে ভিতরে ছিল রোমান্টিক। বললো, ঠিক আছে আমাদের মধুচন্দ্রিমা হবে ইউরোপেই। সত্যি কথা বলতে, তাহের আর আমার বিবাহিত জীবনে লন্ডনে কাটানো দুটো মাসই ছিল সবচেয়ে আনন্দের। সে সময়গুলো ছিল শুধুই আমাদের। ছুটিতে তাহের লন্ডনে চলে আসার পূর্বে তার ভাইকে চিঠি লিখে বলেছিল, 'আমি আমার বউকে চাই লন্ডনে।' লন্ডনে আমার এক ভাই ও তাহেরের এক বোন ছিল। আমি গেলাম সেখানে। আবার আমাদের দেখা হলো। ১৯৭০ সালের জুলাই মাসে।

আমার প্রথম সন্তান জন্মের আগেই তাহের বলেছিল, আমাদের মেয়ে হবে। তার নাম হবে জয়া। হলোও তাই।

ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে তাহের ঠিক ঠিক উপহার নিয়ে আসতো। কিন্তু ঈদে সবাইকে নতুন কাপড় দিতে হবে, তা কিন্তু নয়। বলতো এইদিনে কতোজনেই তো নতুন কাপড় পাচ্ছে না। তিনি কেনাকাটা করতেন না। তবে আমার এবং সন্তানদের জন্য হঠাৎ শখের উপহার নিয়ে আসতেন। লন্ডন থেকে ও আমাকে দুটো চমৎকার কার্ডিগান কিনে দিয়েছিল। ও দুটো ছিল আমার বড়ই পছন্দের। ১৯৭১-এর ৯ ফেব্রুয়ারি আমি পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে এলাম। তখন কার্ডিগান দুটো সঙ্গে আনিনি। পরে ১৯৭১-এর জুলাই মাসে তাহের যখন পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসলো দেশে, তখন সঙ্গে আর কিছুই আনেনি। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও আমার সেই শখের কার্ডিগান দুটো সঙ্গে নিয়েছিল। মাঝপথে অবশ্য মিসেস মঞ্জুরকে (মেজর জেনারেল মঞ্জুরের স্ত্রী) কাঁধে তুলে হাঁটবার সময় ভার কমাবার জন্য কার্ডিগান দুটো ফেলে দিয়েছিল। মনে আছে, তাহের শেষের দিকে অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কাজ, রাজনীতি নিয়ে। আমি মাঝে মাঝে অভিমান করতাম। ও তখন আমাকে বলতো— আমাকে পেতে হলে রান্নাঘর থেকে বের হতে হবে। আমাকে পেতে হলে আমার কাজের সঙ্গে মিশতে হবে। আমার দুঃখ হয়, আজো আমি তাহেরের স্বপ্ন, তাহেরের দেওয়া কাজ সমাপ্ত করতে পারিনি। সংসারের জন্যে, বাচ্চাদের জন্যে তাহের কিছুই

রেখে যেতে পারেনি। সব সময় বলতো, 'চিন্তা করো না। সমগ্র জাতির ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য জড়িত।' জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার জন্য আমাকে এখন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তাই তাহেরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমি সক্রিয় ভূমিকাই রাখতে পারছি না।

তাহেরের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলাম ওতপ্রোতভাবে। ওর লেখার ডিকটেশন নেওয়া, ওর টেলিফোন রিসিভ করা থেকে ওর দৈনন্দিন রুটিনের সব কাজেই ছিল আমার অংশগ্রহণ। এমন কি অল্প সময়ের জন্য বাবার বাড়ি যেতে চাইলে ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়তো।

তাহেরের সঙ্গে আমার শেষ দেখা ১৯ জুলাই ১৯৭৬ সাল। ওর ফাঁসির কয়েক ঘণ্টা আগে। ২০ জুলাই ভোর ৪ টার দিকে ওর ফাঁসি হয়। আমরা শুনেছিলাম 'বিচারে' তাহেরের ফাঁসির রায় হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস করিনি। আমার মনে মনে প্রস্তুতি ছিল, তাহেরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। এর ৭ মাস আগে তাহের গ্রেফতার হয়। ওর কোন খোঁজখবরই ঠিকমতো পাচ্ছিলাম না। আর এই সাত মাসে আমাদের সঙ্গে ওকে দেখা করতেও দেওয়া হয়নি। একবার শুধু দূর থেকে দেখেছি ও কোর্টে যাচ্ছে। গরাদের ওপারে। ও আসতে চেয়েছিল কাছে। কিন্তু আসতে দেওয়া হয়নি। হাত নেড়ে শুধু বলেছিল ভালো থেকো। তাহেরকে যখন ধরে নিয়ে যায় তখন আমাদের ছোট ছেলে মিশু ছিল অত্যন্ত ছোট। বাচ্চাদের খুব ভালোবাসত তাহের। জেলজীবনের ছয় মাস পর যখন আমাদের শেষ দেখা হয় তখন মিশু একটু বড়ো হয়েছে। মিশু তার নানার বাড়িতে থাকায় ওকে দেখাতে পারবো না ভেবে ওর একটা ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম তাহেরকে দেখাবো বলে। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ নিতে দেয়নি। শুধু ওর জন্য ক'টা আম নিতে দিয়েছিল। আমরা তাহেরের সেলে ঢোকামাত্র তাহের হইচই বাধিয়ে দিলো। বললো—জেলার সাহেব আমার স্ত্রী, মা এবং আত্মীয়-স্বজন এসেছে, তাদের বসার জন্য চেয়ার দিন।

যাই হোক, ১৯ তারিখ দুপুর ৩টায় আমরা কারাগারে গেলাম। আমি, আমার মেয়ে এক ছেলে, আমার শ্বাশুড়ি, আমার ভাসুর, আমার বড়ো জা, মেজো জা, আমার ভাই—আমরা সবাই গেলাম। আমার ছোট ছেলে মিশুর বয়স তখন ৯ মাস। ওকে রেখে গিয়েছিলাম মায়ের কাছে। আমাদের দেখে বড়োই উৎফুল্ল হলো। আমার শ্বাশুড়ির কাছ থেকে গ্রামের জমিজামা ফসলের খবর নিলো। আর বারবার শুধু বললো—চিন্তার কিছু নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। ও এতো স্বাভাবিক আর প্রাণবন্ত ছিল যে, আমার মাথাতেই আসেনি আমার স্বামীর ফাঁসি হতে পারে।

সে তার লেখা একটা শেষ চিঠি আমাদের উদ্দেশ্যে জোরে জোরে পড়ে শোনালো। সবার খোঁজখবর নিলো। এরমধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ এসে তাড়া দিলো—সময় শেষ। তাহের বললো- আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু একান্ত সময় চাই। বাকিরা সেল থেকে বের হয়ে গেলো। তাহের আমার হাত ধরে বললো, 'তুমি এতো কালো আর শুকিয়ে গেছো কেন? এতো চিন্তার কি আছে? আমার স্ত্রী হিসেবে তোমাকে আরো সাহসী হতে হবে। আমার স্ত্রী হিসেবে তুমি গর্ববোধ করবে। সবাই আছে।

সবার মধ্যেই বেঁচে থাকবো। তোমরাও বেঁচে থাকবে। আমিতো কোন বিচ্ছিন্ন রাজনীতি করিনি। আমার রাজনীতি ছিল সবার জন্য।' এখনো ভাবলে আমি অবাক হই, তাহের একবারও বলেনি—আজ আমাদের শেষ দেখা। আর কিছুক্ষণ পরেই ওর ফাঁসি হয়ে যাবে। উল্টো হাসলো। জেলে থাকার সময়ে টুকটাক মজার অভিজ্ঞতার কথা বললো। বাচ্চাদের খোঁজ নিলো। বললো, ওদের দিকে খেয়াল রেখো। তারপর ফিরে আসার সময়ে বললো, 'আবার দেখা হবে।' ওর স্বতঃস্ফুর্ততা আর প্রাণবন্ততা আমাকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছিল যে, আমার একবারও মনে হয়নি আর কিছুক্ষণ পরেই তাহেরের ফাঁসি হবে। পরে শুনেছি, ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার আগে ও সেভ করেছে, গোসল করেছে, আমাদের নেওয়া আম কেটে সবাইকে খাইয়েছে। এমনকি আগের রাতে ওকে যখন তওবা পড়াতে আসে, ও বলেছে—'আমি তওবা কেন পড়বো? আমি তো কোন ভুল করিনি। আপনারা যান। আমি ঘুমাবো। সময় মতো ডেকে দেবেন।' সেই রাতে আমি মেজর জেনারেল মঞ্জুরের বাসায় ফোন করি। উনি ফোন ধরেননি। উনার স্ত্রী বললেন, 'আমরা কি করবো? আপনার স্বামীতো নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছেন।' আমি বলেছিলাম, আমি কিছু করতে বলি না। তাহেরের জন্য আমি কারো কাছে যাইনি। কিন্তু কি হতে যাচ্ছে তা কি আমি জানতে পারি না? পরে মেজর জেনারেল মঞ্জুর আমাকে বলেছিলেন—'ভাবি, আমি সেদিন বাসাতেই ছিলাম। কিন্তু আপনাকে কি উত্তর দেবো? তাই ফোন ধরিনি।'

২০ তারিখ ভোর ৬ টায় আমি আবার ফোন করেছিলাম মেজর জেনারেল মঞ্জুরের বাসায়। উনি বললেন—'ভাবী, তাহের যদি এখনো বেঁচে থাকে তো আমি দেখবো।' এ কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝিনি। আর পরে তো জানলাম, তাহের ততক্ষণে নেই। ভোর ৪ টার দিকে ওর ফাঁসি হয়েছে। মৃত তাহেরকেও আমি কাছে পেয়েছি অনেক পরে। ওরা আমাদের কাছে লাশ দেবে না। এখানে দাফন করতে দেবে না। আমার শ্বাশুড়ি তো রীতিমতো ঝগড়াঝাটিই করলেন। ফল হলো না। ওরাই ট্রাকে ওঠালেন তাহেরের লাশ। সোজা নিয়ে গেলো হেলিপ্যাডে। আমাদের বললো, পিছন পিছন আসতে। হেলিকপ্টারে করে লাশ নেত্রকোনায় তাহেরের বাড়িতে পৌঁছে দিলো। ঐ হেলিকপ্টারে ওঠে আমি তাহেরকে দেখলাম প্রথম। দেশের একজন বীর শীর্ষস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কতোটা অসন্মানিত হতে পারে চেয়ে চেয়ে দেখলাম। একটা খাটিয়ার ওপর শুয়ে সে। মাথা, পা বেরিয়ে, গায়ের ওপর শুধু জেলখানার একটা কাপড় দেওয়া।

একটা খটকা আমার প্রায়ই লাগে। বিষয়টি হাস্যকরও বটে! রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে তাহেরের ফাঁসি হলো। কিন্তু আজ যখন আমার নামে আসে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র, তাতে লেখা আপনার স্বামীর জন্য এ দেশ গর্বিত। তা কি করে হয়?

একজন বাঙালি তাহেরের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করতে পারল!

১৯ জুলাই, ছিয়াত্তর; সারাদিন চেষ্টা করেও তাহেরের সঙ্গে আমাদের পরিবারের দেখা মিলছিল না। মামলার রায় হয়ে গেছে ১৭ জুলাই। দেখা করা খুবই দরকার। জেনারেল জিয়া, স্বরাষ্ট্রসচিব সালাউদ্দিন প্রমুখদের বহুবার বলেছি অনুমতি দেবার জন্যে। কোন কাজ হলো না। জেনারেল জিয়া তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। স্বরাষ্ট্রসচিবের একান্ত সচিব সাইফুল ভাইজানের (আরিফুর রহমান) পূর্ব পরিচিত। তিনিও আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। অবশেষে তৃতীয়বারের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর হাল চেড়ে দিয়ে সাইফুল সাহেব আমাদের দরখাস্তটি আলমিরায় ভরে তালা মেরে দিলেন।

হঠাৎ করে প্রেসিডেন্ট সায়েমের দফতর থেকে দুপুরের পর খবর এলো সমগ্র পরিবারকে তাহেরের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। বিচারপতি সায়েম তখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করছিলেন। আমরা একটু অবাক হলাম। এত প্রাণপণ চেষ্টা করেও মামলার রায়ের পর দেখার অনুমতি মিললো না, এখন হঠাৎ করে এ অনুগ্রহ কেন? তা-ও আবার এক্ষুণি যেতে হবে। আমরা দুপুরের খাওয়াও সারতে পারলাম না।

যাহোক, জেলখানার সাধারণ নিয়ম কানুন কিছুই আমাদের জন্য লাগলো না। আমি ও আমার সব ভাবীরা, আরিফ ভাইজান, তাহেরের আব্বা-আম্মা, আমার ছেলে যীশু, আরিফ ভাইয়ের ছেলে বাপীসহ সমগ্র পরিবারকে ফাঁসির আসামীদের কনডেম সেলের পাশে নিয়ে যাওয়া হলো। একসঙ্গে যাওয়া যায়নি। তিন ভাগে ভাগ করে ভেতরে নেওয়া হলো। পরিবারের দু'জন সদস্য বাদ পড়লেন।

তাহের এলো। কথায় কথায় ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গ তুললেন আরিফ ভাইজান, দণ্ড মওকুফের আবেদন করা যায় কি না?

"আমি তো চোর নই যে ক্ষমা ভিক্ষা করবো। আমার ফাঁসি হতে পারে না, তাহেরের সোজা জবাব।

আরিফ ভাইজান সবার বড় ভাই। দায়িত্বের অংশ হিসেবে ক্ষমা চাইবার সম্ভাবনার ব্যাপারে তাহেরের মনোভাব কি তা জানাতে চাইছিলেন। তিনি ব্যর্থ হয়ে আমাকে বললেন, তুমি এবার বলে দেখ। আমিও বললাম—দেখো, তোমার তো ছেলে-মেয়ে আছে, ব্যাপারটা চিন্তা করা যায় কিনা।"

"আমার ছেলে-মেয়েদেরকে দেশের মানুষ দেখবে।"

ব্যাপারটির এখানেই ইতি। জলিকে (তাহেরের ছোট বোন) মন খারাপ দেখে তাহের ডেকে দুষ্টুমী করে বললো, "আপনার মন খারাপ কেন?" তারপর বললো, আমাকে কেউ মারতে পারবে না। আর মারলেও কী? ক্ষুদিরামের পর আমিই তো ফাঁসির অপেক্ষায়। অন্যান্য কথা বলে চলে এলাম। আমরা বুঝতেও পারিনি, জানতেও পারিনি যে, ঐ রাতে তখনই ঢাকা সেনানিবাসে সমর নায়কদের বৈঠক চলছে তাহেরের ফাঁসি কার্যকরী করার পদক্ষেপ নেবার জন্য।

একুশে জুলাই ছিয়াত্তর। সকাল সাতটায় মোহাম্মদপুরের এক বাসা থেকে ঢাকা সেনানিবাসে মেজর জেনারেল মঞ্জুরের (১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে ব্যর্থ অভ্যুত্থানে নিহত) কাছে টেলিফোন করলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে কিভাবে তাহেরের ফাঁসির আদেশ মেনে নিচ্ছেন। আর আপনার ও আপনাদের বন্ধুদের আসল মনোভাবটাই বা কী? আপনাদের অন্তত নিজেদের রাজনৈতিক ও সামরিক নিরাপত্তার কথা ভেবে-চিন্তে কাজ করা উচিত। জেনারেল মঞ্জুর জবাব দিলেন, দেখি এখনো যদি তাহের থেকে থাকে তবে চেষ্টা করে দেখব।

আমি তখনো ভাবতে পারিনি যে এরিমধ্যে ফাঁসি হয়ে যেতে পারে। স্বাভাবিক সময় অনুযায়ীই তো আরো সময় নেবার কথা।

এর আগেরদিন অবশ্য তাহেরের মামলার অন্যতম আইনজীবী এডভোকেট আমিনুল হকের বাসা থেকে জেনারেল মঞ্জুরের বাসায় টেলিফোন করেছিলাম। তার স্ত্রী ফোন ধরলেন। রাগত স্বরে ভদ্রমহিলা আমায় বলেছিলেন, তাহেরের তো মাথা খারাপ হয়েছে, সে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছে। ফল যা হবার তাই হবে। টেলিফোন ছেড়ে দিলাম।

একুশ তারিখের কথায় আসি। জেনারেল মঞ্জুরকে ফোন সেরে ভাইজানের বাসায় ফিরলাম (জনাব আরিফ)। সেখান থেকে গাড়িতে ওঠে অন্য কয়েক জায়গায় যাবো বলে রওয়ানা হচ্ছি, এমন সময় এডভোকেট জিনাত আলী, জনাব শাহ আলম (জাসদের তৎকালীন তথ্য ও গণসংযোগ সম্পাদক) ও খায়রুজ্জামান বাবুল (তৎকালীন নগর গণবাহিনীর কর্মকর্তা, পরে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্য) দৌড়ে এসে আমায় বললো ভাবী আর কোথাও যাওয়া লাগবে না। আমি বুঝে নিলাম সব শেষ। এর পরপরই মুশতাক (তৎকালীন নগর গণবাহিনীর কর্মকর্তা ও পরে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক) ও গণবাহিনীর অন্যান্য কয়েকজন কর্মকর্তা বাসায় এসে পৌঁছল। আমার সঙ্গে তখন আর কেউ, কিংবা পরস্পরের সঙ্গেও কেউ কথা বলছেনা।

আরিফ ভাইজানের ঘরে ফিরলাম। ভাইজানের বাসায় ফোন আসলো তাহেরের মৃতদেহ নেবার জন্য। জেল গেটে গেলে বললো, লাশ আমাদের দেয়া হবে না, তারাই পৌঁছে দেবে। স্বারাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে ভাইজান (জনাব আরিফ) ও আমার শ্বাশুড়ি গিয়ে বললাম, লাশ গ্রামের বাড়িতে এতদূর কিভাবে নিয়ে যাবো। ঢাকায় তাহেরকে সমাধিস্থ করার জন্য বহু চেষ্টা করলাম। তখন তারা জানালো, তারাই পরিবহনের ব্যবস্থা করবে।

তারা গ্রামে লাশ নিয়ে যাবার জন্য সড়ক পথ ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ভাইজান বললো, "এতদূর রাস্তা। লাশ কখন পৌঁছবে কাজলায়?" তখন টাঙ্গাইল ঘুরে ময়মনসিংহ হয়ে তারপর কাজলা যাবার রাস্তা। উদ্দেশ্য ছিল ঢাকায় তাহেরকে সমাধিস্থ করার জন্য যুক্তি দেয়া। ভাইজান বললেন, "তাহের তো মরে গেছে। এখন ওর লাশ এক জায়গায় সমাধিস্থ করলেই হলো। আপনারা তাকে বুড়িগঙ্গায় ফেলেন, বা নিয়ে যান আমাদের কাছে সবই সমান।" এতেও কোন ফল হলো না। শেষ চেষ্টা হিসেবে ভাইজান বললেন, "লাশ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবার সময় যদি ছিনতাই হয়ে যায় তখন আমরা কি করবো?" তখন ওরা বললো, "কেন? সামনে পেছনে সশস্ত্র পাহারা যাবে।" আমরা বললাম, "তাহেরের সমস্ত পরিবার ঢাকায় চলে এসেছে। ওদের সবাইকে নিয়ে দাফন করার জন্য কাজলাতে যাওয়ার ব্যাপারটা খুবই ঝামেলা।"

কর্তারা এরপর টেলিফোনে কোথায় কী সব কথাবার্তা বললেন। বিকেল ৪ টার দিকে জানালেন যে, লাশ হেলিকপ্টারে যাবে।

সরকারি আনষ্ঠানিকতা সেরে বেলা আড়াইটায় জেলগেট থেকে তাহেরের লাশ একটা পুলিশ এম্বুলেন্সে করে বের করা হলো। তখনও পর্যন্ত আমাদেরকে লাশ দেখতে দেয়া হয়নি। লাশবাহী এম্বুলেন্সের আগে পিছে চার-পাঁচ ট্রাক সৈন্য। সঙ্গে গোয়েন্দা বাহিনীর প্রচুর সাদা পোষাকধারী। আমদেরকে ওদের একটা গাড়িতে উঠিয়ে তৎকালীন তেজগাঁও বিমান বন্দরে লাশের সঙ্গে নিয়ে গেলো। হেলিকপ্টারে ওঠানো হলো লাশ। আমরা উঠলাম। দেখলাম অবহেলা অযত্নভাবে জেলখানার এক ছেঁড়া চাদরে মুড়ে তাহের ষ্টেচারে শুয়ে আছে। কপাল বেরিয়ে আছে, বেরিয়ে আছে পায়ের আধখানা।

হেলিকপ্টারে ছিলেন ভাইজান, ভাইজানের আত্মীয় জনাব ইসলাম, আমি ও আমার সমস্ত ভাবীরা। আর ছিলেন এডভোকেট জিনাত আলী। সেই চরম শ্বাসরুদ্ধকর দিনগুলোতে হুলিয়া মাথায় নিয়ে নেতৃবৃন্দতো আসতেই পারতেন না, আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই তখন পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদের ভয়ে কাছে ঘেঁষতো না। তখন এই তরুণ আইনজীবী জিনাত আমাদের পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। আমি তার সাহস ও দৃঢ়তা দেখে অবাক ও বিস্মিত হতাম।

শ্যামগঞ্জ বাজারে হেলিকপ্টার নামল। আগে থেকে ময়মনসিংহ হতে প্রচুর সৈনিক, বিশেষ পুলিশ ও কমাণ্ডো এনে জায়গাটা ঘিরে রাখা হয়েছিল। হেলিকপ্টার নামার সঙ্গে সঙ্গে সব সৈন্যরা যুদ্ধ আক্রমণের কায়দায় পজিশন নিল। তারা সম্ভবত লাশ ছিনিয়ে নেয়ার ভয়ে ভীত ছিল। হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন পর্যন্ত তারা ভয়ে এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধ করেনি।

কোথেকে খবর পেয়ে প্রচুর জনতা তাহেরকে দেখার জন্য ভীড় করলো। লাশ রেখেই হেলিকপ্টার উড়াল দিল। শ্যামগঞ্জ বাজারের কাছেই তাহেরের এক চাচার বাসায় গোসল ও কাফন পরানো হলো। কাছেই এক মসজিদের বড় ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে ঈদগাহ ময়দানে জানাজা হলো। তখনও হাজার হাজার লোক ছুটে আসছিল লাশের দিকে।

ওখান থেকে কাজলা গ্রাম তিন মাইল দূরে। গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে রওয়ানা দিলাম সবাই। পৌঁছতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল। গিয়ে দেখলাম আগে থেকেই সেনাবাহিনী যুদ্ধের সাজে পজিশন নিয়ে বসে আছে। তারা আত্নীয়-স্বজনকে উত্ত্যক্ত করছিল যে, কোথায় কবর দেয়া হবে তাড়াতাড়ি জায়গা দেখাও। তারা নিজেরাই এক জায়গায় কবর খঁড়ছিল। আমরা পৌঁছবার পর পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করবার জন্য জায়গা নির্ধারণ করলাম। সেনাবাহিনীর ওরাই কবর খুঁড়ল। সাড়ে নয়টার সময় তাহেরের দেহ এদেশের মাটির নীচে আশ্রয় নিল।

সমাধিস্থ করার পর একুশ দিন সেনাবাহিনী ক্যাম্প গেড়ে সমাধির পাশে পজিশন নিয়ে থাকলো। তাহের শহীদ হবার তিন দিনের দিন ওর কুলখানি হলো। তারপর আমি ছাড়া পরিবারের আর সবাই সাংসারিক জীবন যাত্রার টানে ওখান থেকে চলে আসে। আমি আমার তাহেরের মাটির আবরণে ঢাকা অস্তিত্বের পাশে দেড় মাস রইলাম। তারপর বাবার বাড়ি কিশোরগঞ্জে চলে এলাম।

এর আগের কিছু কিছু ঘটনা স্মৃতিতে জেগে আছে এখনো। অবশ্য অনেকে এসব ঘটনা আমার চেয়েও ভাল জানেন। তবুও তাহেরের ব্যক্তিগত জীবন সঙ্গী হিসেবে সেসব স্মৃতির মূল্য আমার নিজের কাছে যেভাবে লেগেছে অনেকটা সেভাবে বলার চেষ্টা করবো।

১৭ নভেম্বর '৭৫ এলিফেন্ট রোডে ইউসুফ ভাইজানের বাসায় আমি আসলাম। সেখানে তাহেরের আসার কথা। দেখলাম তাহের জনাব মোহাম্মদ শাজাহানের (তদানীন্তন জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি) সঙ্গে কথা বলছেন। তারপর কথা শুরু হলো জনাব হাসানুল হক ইনুর (জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক) সঙ্গে। এরপর কথা শুরু হলো মুশতাক, বাবুল, দুলাল, বাহার, সবুজ, বেলাল, বাচ্চু ও গণবাহিনীর অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে। তাহেরের সঙ্গে দেখা করার প্রোগ্রাম নিয়ে আসছি অথচ আমার সঙ্গে কথা বলার ফুরসতই হচ্ছে না। আমি কিছু কমলা নিয়ে এসেছিলাম। কথা শেষ, হঠাৎ তাহের উঠে দাঁড়িয়ে বললো, এবার আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটু সময় নেব। রোমান্টিক কায়দায় কথাগুলো সবার সামনে সে ছুঁড়ে দিল।

খাবার টেবিলে বসে কথা হচ্ছিল।

ভয়টয় পেয়েছো কিনা? প্রথম প্রশ্ন?

"তোমার কোন চিন্তাও হলো না? এতবড় একটা এ্যাকশন করলে, আমি নারায়ণগঞ্জে আছি, আমার কি হয় না হয়, আমাকে একা রেখে আসলে।"

যদিও ৭ নভেম্বরের আগে থেকেই জানতাম প্রস্তুতি চলছে। তবুও একটু অভিমান আমার কণ্ঠে। ওকে কথাগুলো বললাম।

উদ্ভাসিত হাসি ছড়িয়ে তাহের বললো, "তোমাকে কেউ কিছু করবে এত বড় সাহস দুনিয়ার কারো নেই। আমি এটা জানি বলেই তো... ... ...।"

"থাক, আর বাহাদুরি ফলাবার দরকার নেই। আর তুমি তো জনগণের নেতা। আমার সঙ্গে সময় দেবার ফুরসত না থাকারই কথা।" খেয়ে-দেয়ে কোথায় যেন ও মিটিং করতে চলে গেল।

আমি তখনও নারায়ণগঞ্জে তিন সন্তান নিয়ে একা থাকি। ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার অভ্যুত্থানের পর স্থানীয় থানার কর্মকর্তারা আমার খোঁজ খবর নিত, পাহারার জন্য পেট্রোল পাঠাত। বেশ সন্মান করতো ওরা। ২১ নভেম্বর থেকে দেখি পেট্রোল উধাও। এর মাঝে ১৯ নভেম্বর আমার দেবররা সব এসে আমার বাসায় খোঁজ খবর নিয়ে গেল। একরাত সবাই থেকেও গেল। পরদিন সেনাবাহিনীর একটি জীপ এসে খুঁজে গেল কারা কারা এসেছিল। পুলিশ পেট্রোল তুলবার পর তাহেরের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাহের বুঝতে পারলো গোলমাল শুরু হলো বলে। আমাকে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বললো। ২২ নভেম্বর ইউসুফ ভাইজান ও ভাবী এসে বাসায় থেকে পরদিন সকালে ঢাকায় ফিরে গেলেন।

কয়েক ঘন্টা পরই ইউসুফ ভাইয়ের টেলিফোন পেলাম।

"জেলখানা থেকে বলছি।"

"কী ব্যাপার।"

তোমার ওখান থেকে ফিরে বাসায় গিয়ে দেখি সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হয়ে আছে। আমি গেলাম, আমাকে গাড়িতে করে এখানে নিয়ে এলো। জাসদ নেতা শাজাহান সিরাজের (তখন তিনি জেলে) এলিফেন্ট রোডের বাসায় ফোন করলাম।

'আরে এখনি এখান থেকে জলিল, রব, ইনুসহ সবাইকে ধরে নিয়ে গেল।'

'খবর টবর কী? ইউসুফ ভাইতো জেলে।'

সন্ধ্যায় তাহের আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল। আমি জানালাম যে, গ্রেফতারের খবর পেয়েছি। তাহের জানালো জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। হয়তো এড়িয়ে যাচ্ছে। এরশাদকে ফোন করলে জানালো, এটা পুলিশী ব্যাপার।

আমি জিয়া, মঞ্জুর, এরশাদের সঙ্গে যোগাযোগের বহু চেষ্টা করলাম। টেলিফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ তো বুঝতে পারছিলাম। অবশেষে কর্নেল অলি আহমেদকে পেলাম। তার সঙ্গে আমাদের পূর্ব পরিচয় ছিল। সে কুমিল্লার ব্রিগেড মেজর ছিল (বর্তমানে বিএনপি'র নেতা)। তিনি বললেন, ভাবী আমরাও তো ব্যাপারটা শুনেছি। দেখি কিছু করা যায় কিনা। তবে ব্যাপারটা তো পুলিশের। জিয়ার সঙ্গে আলাপ করবো ব্যাপারটা নিয়ে।

পরদিন দুপুরে তাহেরের টেলিফোন পেলাম বাসায় বসে।

"জেলখানা থেকে বলছি"।

"কীভাবে গমন?"

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস, এম, হলের হাউস টিউটরের বাসায় ছিলাম। ওখান থেকে আগমন।"

কিছুক্ষণ পর অধ্যাপক আনোয়ার ফোন করলো, "ভাবী, ভাইজান তো ধরা পড়ল! আমিও প্রায় ধরা পড়ছিলাম। মিটিং এ যাবার জন্য হলের দিকে এগুতেই দেখি চারদিকে পুলিশ। দেখলাম ভাইজানদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে।"

পরদিন আরিফ ভাইজান তাহেরের যুদ্ধাহত পায়ের জন্য ক্রাচ, জামা দিতে গেলেন। প্রথমে দিতে দেয়া হলো না।

২৬ নভেম্বর সকাল ১১ টার দিকে দুটো মেয়ে আমাকে ফোন করে জানালো যে, "ভারতীয় দূতাবাসে এ্যাকশন হয়েছে, আপনাদের দুটো ছেলে মারা গেছে।" এরপর আরো ফোন আসতে লাগলো। বেলা ১২ টায় রেডিওর খবরে নিশ্চিত হলাম যে, ক'জন মারা গেছে। বিকেল ৪ টায় পলাতক অবস্থায় আনোয়ার আমাকে বিষাদভরা কণ্ঠে ফোন করে জানালো যে, বাহার, বাচ্চু, মাসুদ, হারুন মারা গেছে। বেলাল, সবুজ আহত অবস্থায় ধরা পড়েছে। আমি তাহেরের নারায়নগঞ্জের ড্রেজার অফিসে ফোন করে গাড়ি চাইলাম ঢাকা যাবার জন্য। ওরা দিতে চাইলো না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, বাসে যাওয়া ঝুঁকিপূর্ণ। রাগত স্বরে বললাম, "এতদিন চাকুরি করার পর যদি এ বিপদের মূহুর্তে একটা গাড়ি না পাই, এটা কোন ধরনের নৈতিকতা?"। গাড়ি পেলাম শেষ পর্যন্ত।

গাড়ি করে এলিফেন্ট রোডের বাসায় এসে জানলাম আরিফ ভাইজান, ভাবীসহ লাশ দেখতে গেছেন। কার্ফু চলছিল। পারমিশন নিয়েই লাশ দেখতে হলো। পরদিন হাসপাতালের মর্গে ছদ্মবেশে আনোয়ার গিয়ে লাশগুলো দেখে আসলো। মেডিকেলের ছাত্রলীগ নেতা শফিক ও অন্যান্যরা আনোয়ারের গোপনভাবে দেখার ব্যবস্থা করেছিল।

এ ঘটনার পর তাহেরের সঙ্গে জেলে দেখাতো দূরের কথা যোগাযোগ করা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। ওকে ঢাকা জেল থেকে কোথায় পাঠালো বলতে পারলাম না। ১০/১২ দিন পর এক সূত্র থেকে জানা গেল যে, তাহের রাজশাহীতে আছে। তখন থেকে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা পরিবারের সব সদস্যদের খোঁজ-খবর, তথ্যাদি নিতে শুরু করল। তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিল, জেনারেল জিয়ার সঙ্গে আপনার কী ধরনের সম্পর্ক ছিল? তাহেরের ভাইদের নাম কি? বুঝলাম তাহের আমাদের কাছে চিঠি পাঠাবার চেষ্টা করেছিল, ধরা পড়েছে চিঠি।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৫ নারায়ণগঞ্জের বাসা ছেড়ে দিলাম। আরিফ ভাইয়ের মোহাম্মদপুরের বাসায় কিছুদিন থেকে কিশোরগঞ্জে বাবার বাড়িতে আসলাম।

এর দেড় মাস পর তাহেরের একটা চিঠি পাই। সে লিখেছে, আমাদের জন্য চিন্তা করোনা। বরিশালে ইউসুফ ভাই আছে, তাদেরসহ অন্যান্য নেতাদের খবর নাও। বাইরের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের খবর কী? ইত্যাদি। চিঠির জবাব লিখলাম। একশত টাকা পাঠালাম। মে মাস পর্যন্ত রাজশাহী জেলে একটা নির্জন বিচ্ছিন্ন জায়গায় তাহের কাটালো। জুনে ওকে ঢাকায় আনা হলো। হঠাৎ আমার ভাই সাব্বির ঢাকা থেকে আমাকে একটা চিঠি পাঠালো। লিখল যে, একটা ষড়যন্ত্র মামলা সাজানো হচ্ছে সম্ভবত। সে নিশ্চিত করে বলতে পারলো না বেসামরিক আদালতে কিনা। ঢাকা এসে ঢাকা জর্জ কের্টে ওর সঙ্গে দেখা। পিস্তল কেড়ে নেয়ার একটা মামলা সাজিয়ে তাকে বিচারের জন্য ডেকে আনা হয়েছিল। মামলা মিথ্যা প্রমাণ হয়।

দীর্ঘ কয়েক মাসের পর এটা আমাদের প্রথম দেখা। কোর্টকে তাহের জানালো যে পরিবারের সঙ্গে তাকে এ দীর্ঘদিন দেখা করতে দেয়া হয়নি, কোর্ট সারাদিন তাহেরকে আমাদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দিল। দুপুর হয়ে এলো। পুলিশরা ক্ষুধায় ভুগবে এ বিবেচনায় তাহের বললো, আজ থাক, পুলিশদেরকে একটু রেহাই দেয়া দরকার।

এরপর বারবার অনুমতি চাইলেও কোন সময় আমরা তাহেরের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাইনি। এরমধ্যে আনোয়ার ঢাকা কলেজের ক্যান্টিন থেকে মার্চের মাঝামাঝি মুশতাক ও গিয়াসসহ গ্রেফতার হয়। এয়ার ফোর্সের কর্পোরাল ফখরুল আলম বিশ্বাসঘাতকতা করে ওদের ধরিয়ে দিয়েছিল। আমরা তাহের ছাড়া তার অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে (ইউসুফ ভাই, আনোয়ার, বেলাল) দেখা করার সুযোগ পেতাম।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ইউসুফ হায়দার বললো, তার মাধ্যমে হাইকোর্টে দেখা করার অনুমতি চাওয়ার জন্য। স্বরাষ্ট্রসচিব থেকেও অনুমতি নিয়ে জেলগেটে এসে পৌঁছলাম। বললো, দেখা হবে না। তাহের জানতে পেরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। কোর্ট থেকে ভেতরে নেবার পথে দূর থেকে আমাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো। আমরা পরস্পরের প্রতি হাত নাড়লাম।

প্রায়ই এডভোকেট চাকলাদারের মাধ্যমে ছোট ছোট চিঠি পেতাম। এতে নানা টুকরো টুকরো কথা ছিল।

১৭ তারিখে মামলার রায় হবার পর ১৮ তারিখে টাঙ্গাইলের সন্তোষে মওলানা ভাসানীর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, দেশে যা শুরু হয়েছে। আজ তাহেরকে মারবে, কাল কেউ আবার জিয়াকে মারবে। এইতো চলছে। তিনি দণ্ডাদেশ বাতিলের আহ্বান জানিয়ে জিয়ার কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর কর্তা ব্যক্তিদের অনেকে চাইতো আমি তাদের কাছে গিয়ে কান্নাকাটি করি, ক্ষমা চাই, তাহেরকে ক্ষমা চাইতে বলি। কিন্তু তাহের তো বটেই, শ্বশুর-শ্বশুড়ী, আমি এধরনের কোন ধারণারই প্রশ্রয় দিতাম না। দল থেকেও দৃঢ়তা দেখানো হয়েছিল।

তাহের আমার কাছে জেল থেকে বেশ কিছু চিঠি পাঠিয়েছিল। তার চিঠিতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছিল সামান্যই, প্রায় সবই ছিল দেশ ও রাজনীতি নিয়ে। জেলখানায় একটা খাতায় তাহের অনেক কিছু লিখেছিল। বহু চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে খাতাটা উদ্ধার করতে পারিনি। সেখানে তাহের ৭ নভেম্বর, তার পূর্বাপর ঘটনা, ভবিষৎ রাজনীতি, মামলা নিয়ে অনেক কিছু লিখেছিল।

সোনালী স্মৃতিপটে আজো

তাহেরের সঙ্গে আমার জীবন খুবই অল্পদিনের। আর এই অল্পদিনেই আমার ব্যক্তিগত জীবন ও জাতীয় জীবনের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ উত্থানপতন ঘটে গেছে। এই অল্পদিনের অভিজ্ঞতা মনে করতে বসে কী-বা বলব? আমি যা বলব তা জানে সমগ্র জাতি, জানেন কর্নেল তাহেরের সুযোগ্য সহ-কর্মীবৃন্দ।

১৯৬৯ সালের ৭ আগস্ট আমাদের বিয়ে হয়। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ণ বিভাগে এম.এস.সি পড়ছি। ও তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিল। অবশ্য বিয়ের কার্ড ছাপা হয়ে যাবার পরে তাহের মেজর পদে উন্নীত হয়। আমাদের দুঃখ ছিল বিয়ের কার্ডে তাহেরের নামে মেজর লাগাতে পারিনি বলে। কলেজ জীবনে আমি অল্প স্বল্প রাজনীতিতেও জড়িত ছিলাম। আমি তখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) করতাম। ১৯৬৮ সালে ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের নির্বাচিত সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা ছিলাম। ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে রাজপথকে চিনেছি।

বিয়ের পর তাহের চিটাগাং চলে যায়। সেখান থেকে ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাওয়ারপিণ্ডি ও পেশোয়ারের মাঝামাঝি অবস্থিত 'আটক ফোর্টে' বদলি হয়। সেখানে ও স্পেশাল এ্যালাইড গ্রুপের কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়। আটক ছিল মোগল সম্রাট আকবরের কেল্লা। আমি ওর সাথে আটক যেতে পারিনি। কারণ আমার তখন পরীক্ষা চলছিল। আটক থেকে তাহের উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়। ও সেখানে ৬ মাস থাকে। পরীক্ষার পরে আমি লন্ডনে চলে যাই। সেখানে আমার এক ভাই থাকত। তাহের আমেরিকা থেকে লন্ডন চলে আসে। আমাদের দেখা হলো সেখানে। তখন '৭০-এর জুলাই মাস।

সেখান হতে আমি ওর সাথে আটকে চলে আসি। সেখানে আমি সাত মাস ছিলাম।

১৯৭০-এর ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। তাহের বলত, 'পাঞ্জাবীরা সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না- যদি বাঙ্গালীরা নির্বাচনে জয়লাভও করে। নির্বাচনের পর একটা পরিবর্তন ঘটবেই।' সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্র যখন স্বরূপে উদঘাটিত হতে শুরু করলো তখন তাহের আমাকে বাংলাদেশে

পাঠিয়ে দিল। ও আমায় বললো, যদি যুদ্ধ লাগে তাহলে যেন আমি দেশের কাজে লাগি। ভাইদের তাহের উপদেশ দিয়েছিল তারা যেন যেকোন অবস্থায় দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাহের আরো বললো, কোন গণ্ডগোল বেধে গেলে সবার আগে দেশে ফিরব। এমনি সময়ে '৭১-এর ৯ ফেব্রুয়ারি আমি দেশে এলাম। আমাদের বড় মেয়ে নীতুর জন্ম হলো।

'৭১-এর ২৫ মার্চ যুদ্ধের শুরু। আমরা গ্রামে চলে গেলাম। বাহার (তাহেরের ছোট ভাই '৭৫ এর ২৬ নভেম্বর ভারতীয় দূতাবাস অভিযানে শহীদ), বেলাল (তাহেরের আরেক ছোট ভাই), আমার ভাই সাব্বির মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিল। পাকিস্তানে আটক অবস্থায় তাহের চিঠি পাঠালো এই লিখে যে, সময় হলে চলে আসব। '৭১-এর জুলাইয়ে তাহের চলে আসল। আকাশবাণীর খবরে বলা হলো, পাকিস্তান থেকে চারজন গুরুত্বপূর্ণ বাঙ্গালী সামরিক অফিসার পালিয়ে এসেছে। আমরা তখন আমার শ্বশুরবাড়ি নেত্রকোনার কাজলা গ্রামে আছি। সাঈদ ভাই (তাহেরের ভাই), সাব্বির আহমেদও এসে আমাদের সাথে যোগ দিল। অচিরেই খান সেনারা আমার শ্বশুরবাড়ি ঘেরাও করলো। আমরা কয়েকজন আগেই সরে পড়েছিলাম। খানসেনারা আমার আব্বা-আম্মা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি তাহেরের বড় ভাই আরিফ, তার স্ত্রী ও আমার বোনকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। তখন ঐ অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল পাকিস্তানী ব্রিগেডিয়ার কাদির। তাহেরের সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল এবং সে তাহেরকে খুব ভালো জানত। কাদির বন্দিদের বললো- তারা যেন তাহেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। তাহের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন খুব ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার। আমি তার প্রাণের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। এ ধরনের নানা কথা বলার পর ব্রিগেডিয়ার কাদির বন্দিদের ছেড়ে দিল। আমরা তখন পালিয়ে আটপারা থানার বুরবুরা সুনুই গ্রামে এক মাস্টার খোদা নেওয়াজ খানের বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। মাস্টার সাহেব আমাদের জন্য প্রচুর কষ্ট করেছেন।

ওখান থেকে আমি মাহেন্দ্রগঞ্জ ক্যাম্পে চলে যাই। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের ইয়ুথ ক্যাম্পেও থেকেছি। সেখানে দেখেছি মাতৃভূমিকে মুক্ত করার প্রেরণায় তের চৌদ্দ বছরের ছেলেরা ক্যাম্পে চলে এসেছে। তাদের বাবা মায়েরাও হয়ত জানতো না। যুদ্ধের দিনগুলোর সেই সোনালী স্মৃতি আমার জীবনের বিরাট সম্পদ। দেশকে ভালোবাসা কী, আর কী তার ভালোবাসার স্বাদ সে যুদ্ধে না গেলে আমি হয়তো তা আজো বুঝতে পারতাম না।

এরপর তুরায় গিয়ে ১ দিন হোটেলে থেকেছি। আমি সব সময়ই তাহেরের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকতে চাইতাম। কিন্তু সাথে অন্যান্য মেয়েরা ছিল। তাদের দেখাশোনা করার প্রয়োজনে আলাদা থাকতে হতো। ভারতীয় বিএসএফ-এর একটা গোয়ালঘর পরিস্কার করে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো। তাহের এসে আমাদের বললো তোমরা মুক্তিযুদ্ধের সময় এর চাইতে বেশি আশা করেছিলে নাকি? আমি জবাবে বললাম প্রশ্নই ওঠে না। বরঞ্চ আমি সরাসরি তোমাদের সঙ্গে ক্যাম্পে যেতে চাই। সেখানে দেখেছি

সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় কত কচি ছেলেরা যুদ্ধে যোগ দিতে এসেছে। তোমরা যারা সেনাবাহিনীতে ছিলে তারা হয়তো কর্তব্যের তাগিদে করছ কিন্তু এ ছেলেরা? সেই আস্তানায় আমাদের সঙ্গে ছিল ডলি, জলি (তাহেরের ছোট দু' বোন) আমার মেয়ে নীতু, ডাঃ হুমায়ূন, একে আব্দুল হাই (বর্তমানে কন্ট্রোলার ড্রাগস বিভাগ—মুক্তিযুদ্ধকালীন জেড ফোর্সের চীফ মেডিকেল অফিসার), তার স্ত্রী ও বাচ্চা।

আমি তাহেরের জন্য মাসিক বরাদ্দ ৪৫০/- টাকা থেকেই খরচ চালাতাম। সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসারদের স্ত্রী, আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ (যেমন তাহেরুদ্দীন ঠাকুর), সিপিবি'র নেতারা এসে আমায় বলত আপনি কলকাতায় চলে যাচ্ছেন না কেন? যুদ্ধক্ষেত্রের এত কাছে অবস্থান করাটা মোটেও নিরাপদ নয়। আমি বিনয়ের সঙ্গে তাদের বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকতে চেয়েছি।

এরমধ্যেই ইউসুফ ভাই (তাহেরের বড় ভাই) সৌদি আরব থেকে লন্ডন হয়ে ১১নং সেক্টরে এসে যোগ দিলেন। ইউসুফ ভাই পাকিস্তান বিমানবাহিনীর ফ্লাইট সার্জেন্ট ছিলেন এবং সৌদি আরবে ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন। তিনি এসেই লক্ষ্য করলেন যে, শহীদ বাঙ্গালী মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতের মাটিতে কবর দেয়া হচ্ছে। তিনি এর প্রতিবাদ জানালেন। এরপর থেকে সেক্টর কমাণ্ডার কর্নেল তাহেরের নির্দেশক্রমে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের মাটিতেই সমাধিস্থ করা হতো।

১৪ নভেম্বর তাহেরের জন্মদিনে কামালপুর দখল হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের দেবার জন্য উপহার সামগ্রী ঠিক করছিলাম। বিকেলের দিকে যাব- তাই প্রস্তুত হচ্ছি। দুপুরে বিএসএফ-এর কর্নেল রঙ্গরাজ ও তার স্ত্রী এবং একজন শিখ মেজর এসে আমাকে যুদ্ধের ভয়াবহতা বিপদাপদ সম্বন্ধে অনেক উপদেশ ও শান্তনার সুরে কথাবার্তা শুরু করলেন। আমি বললাম, আসল ঘটনাটা খুলে বলুন। আমরা তো যে কোন ঘটনার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি। তখন তারা বললো যুদ্ধে তাহের আহত হয়েছে। শুধু তার পায়ে গুলি লেগেছে।

তাহেরকে হেলিকপ্টারে করে বিএসএফ ফিল্ডে আনা হলো। চাদর দিয়ে ওর গা ঢাকা ছিল। সঙ্গের লোকেরা জানালো এতক্ষণ ওর পুরোপুরি জ্ঞান ছিল। এইমাত্র ঘুমিয়েছে। আমি দেখেছি এর আগে ক্যাপ্টেন মান্নানের পায়েও গুলি লেগেছিল, মাত্র একমাস পর সে যুদ্ধে ফিরে যায়। তাই কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইনি। তাহেরকে গৌহাটি কম্বাইন্ড সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো; আহত তাহেরের সঙ্গে ইউসুফ ভাই গেলেন। ইউসুফ ভাই উদ্যোগ নিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে তাহেরের আহত দেহকে দ্রুত স্থানান্তরের ব্যবস্থা না করলে হয়তো প্রচুর রক্তক্ষরণে যুদ্ধক্ষেত্রেই মারা যেত।

পরেরদিন খবর এল গৌহাটি যেতে হবে। যেতে যেতে সন্ধ্যা হলো। আমি ও আনোয়ার (তাহেরের ছোট ভাই) গেলাম। তখনও আহত রোগীটির ৭২ ঘণ্টা বিপদসীমা পার হয়নি। ডাক্তার আমায় বললো, আপনাকে দেখার জন্য তিনি খুবই উদগ্রীব। আপনি দেখা দিয়েই যেন চলে আসেন। চাদর উঠিয়ে দেখলাম একটি পা

নেই। ৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে ওর যে পায়ে গুলি লেগেছিল সেই পা'টিই ৭১ সালে এসে পাকিস্তানী গোলায় উড়ে গেল।

আমার কাছে ব্যাপারটি অকল্পনীয় ছিল। তবুও আমি ধৈর্য্যহারা হলাম না। ওকে বললাম, তোমার প্রাণতো বেঁচে আছে। তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা পাবেই। আমি তো তোমার পাশেই রয়েছি। তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পার। এত অসুস্থতার মাঝেও তাহের আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যাপার দেখাশোনা করার জন্যে ডাক্তারকে বললো। একমাস সে হাসপাতালে ছিল। ক্ষতস্থান ড্রেসিং করার সময় সে নিজে তাকিয়ে দেখত। এক ভারতীয় মেজরের গোড়ালিতে আঘাত ছিল। আমরা দেখেছি সে ব্যাথায় আত্মহত্যা করতে চাইত। কিন্তু তাহের নিজে আশে পাশের লোকদেরকে সাহস যোগাত, তাদের খাবারের অসুবিধা তদারক করত। তাহেরকে আমি হুইল চেয়ারে করে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়াতাম। হাসপাতালে তাহেরকে দেখার জন্যে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ, মণি সিং, মতিয়া চৌধুরী এসেছিলেন। ভারতের মেঘালয় প্রদেশের তৎকালীন গভর্নরও সস্ত্রীক দেখতে এসেছিলেন। আমার আত্মীয় আওয়ামী লীগ দলীয় এম পি জনাব আবদুস সাত্তার তদানীন্তন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নিয়ে এসেছিলেন। তাহের কিছুতেই সে সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি হননি। তখন সে আমাকে আত্মীয়তার সূত্রে তাহেরের ওপর প্রভাব খাটাবার বহু চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ফল হলো না।

বাংলাদেশের পরিচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও সামরিক অফিসাররা প্রায়ই বলতো তাহের তুমি শুধু শুধু জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ কেন? ভারতের সাথে আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে। এ ডিসেম্বরেই আমরা দেশে ফিরে যাব। তাহের কিছুতেই এসব কথা সমর্থন করতে পারত না। ও বলতো নিজেরা নিজেদের দেশ মুক্ত করতে না পারলে দেশ ঠিকমতো স্বাধীন হবে না।

গৌহাটির ডাক্তাররা জানাল লক্ষ্ণৌতে ওর আরো একটা অপারেশন হবে। সেখানে আনোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে তাহের চলে গেল। তাহেরকে বিদায় জানিয়ে আমরা তুরা হয়ে ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরে এলাম।

৭২ সালের এপ্রিলে পুনা আর্টিফিশিয়াল লিম্ব সেন্টার থেকে কৃত্রিম পা নিয়ে তাহের দেশে ফিরল। সে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম এডজুট্যান্ট জেনারেল নিযুক্ত হলো। তাহেরকে এডজুট্যান্ট জেনারেল নিযুক্তির পেছনে সেনাবাহিনীর তদানীন্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমএজি ওসমানীর যুক্তি ছিল উক্ত দায়িত্ব থেকে সেনাবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও নীতি নির্ধারণী ব্যাপারে তাহের তার যোগ্যতার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। তাই তাহের দেশে ফেরা পর্যন্ত ঐ পদটি শূন্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তাহের যখন কতিপয় খুবই উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ও তৎপরবর্তী সময়ে সংঘটিত দূর্নীতিমূলক অপরাধের তদন্ত শুরুর নির্দেশ দিল তখনই বিধি বাম হলো। তার চাকুরি অন্যত্র ন্যাস্ত করা হলো। '৭২-

এর মে কিংবা জুন মাসে তাহেরকে কুমিল্লা সেনানিবাসে ৪৪ তম ব্রিগেড কমাণ্ডার নিযুক্ত করা হলো। এর আগে কর্নেল জিয়াউর রহমান ঐ দায়িত্বে ছিলেন।

নব্য স্বাধীন বাংলদেশে সৈনিকরা কী কাজ করবে এ সম্বন্ধে তাহের চিন্তা ও কাজ দুটোই শুরু করলো। সেনাবাহিনীকে উৎপাদনশীল সেনাবাহিনীতে রূপান্তরের কর্মসূচী তৎকালীন সরকারের কাছে তাহের পেশ করলো। সেই সঙ্গে তাহের তার সীমিত পরিসরে বাস্তব পদক্ষেপ নিল, জুনিয়র অফিসাররাও তার কথামতো কাজ শুরু করলো। শিক্ষা কোরের সৈন্যদেরকে আশে-পাশের এলাকার বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমে লাগানো হলো। মেডিক্যাল কোরেরজওয়ানদের জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে আশেপাশের গ্রামে পাঠানো হলো। সেনানিবাসের ভেতরে নানা শব্জি, ফল ও অন্যান্য গাছ লাগানো শুরু হলো। চিন্তাটা ছিল এই যেন, নিজস্ব আয় দিয়েই উৎপাদনশীল কাজের প্রক্রিয়ায় জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। পাশাপাশি যে জনগণের পয়সায় সেনাবাহিনী লালিত হয় এবং সৈনিকরা যে জনগণের সন্তান তাদের সুখ-দুঃখ, অভাব অভিযোগের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পৃক্তি যেন ঘটে। পরাধীন দেশের গণবিচ্ছিন্ন, ভাড়াটে সেনাবাহিনীর বদলে জনগণের উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ড তাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি সংগ্রামের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যেন সত্যিকারের জনগণের বাহিনী হিসেবে গড়ে ওঠে- সেটাই কর্নেল তাহেরের স্বপ্ন ছিল।

স্বামীর এ কর্মযজ্ঞের প্রেক্ষাপটে আমার ভূমিকাটা কী হবে? আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্বামীর রণাঙ্গনে।

যুদ্ধে শহীদ সৈনিকদের স্ত্রীদের জন্যে ছিল উইডো হোম। তারা শুধু মাসে মাসে ভাতা ও রেশন পেত। ভেবে দেখলাম এরা এভাবে দিন দিন পরনির্ভরশীল হয়ে যাবে। এদেরকে উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। চাঁদা তুলে তাদের জন্যে সূচী শিল্প, কুটির শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করলাম। কুমিল্লার জাহানারা কটেজ ইন্ড্রাস্ট্রিজ থেকে আমরা তাঁত এনে বসালাম। সঙ্গে সঙ্গে ওদের পড়াশোনা শেখাবার ব্যবস্থাও করতাম। সৈনিকদের স্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করে ওদের উদ্বুদ্ধ করলাম, ওদের সমস্যা শুনতাম। মাসে একবার ওদের জন্যে আনন্দ অনুষ্ঠান খেলাধুলার আয়োজন করতাম। আমার একাজে আমি মেজর ডালিম, মেজর আনাম, কর্নেল রহমান ও অন্যান্য অফিসারের স্ত্রীদের সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি। আমি চাইতাম ওরা গৃহকাজে সুনিপুণ হয়ে উঠুক। মাঝে মাঝে আমি সৈন্যদের ব্যারাকে ওদের অন্দর মহল দেখতে যেতাম।

আমি কুমিল্লার কোর্টবাড়ির লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করেছি। উদ্দেশ্য ছিল ফলের বাগান করা, ফল গাছ লাগানো সম্বন্ধে শিখে তা সৈনিকদের মাঝে প্রচার করা। লেবু গাছ, আনারসের চারা এনে লাগাবার ব্যবস্থা করেছি। এসব লাগানো ও রক্ষণাবেক্ষণে পদ্ধতি প্রচারের জন্য নিয়মাবলী সাইক্লোস্টাইল করে সৈনিকদের মাঝে বিতরণ করেছি। সেবার আনারস বিক্রি করে সেনানিবাসের প্রচুর টাকা আয় হয়েছিল।

আমি ছিলাম তাহেরের বিকেলের সঙ্গী। আমি তাকে নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে বেড়াতে যেতাম।

বলাবাহুল্য তদানীন্তন সরকার ওর এসমস্ত কাজ পছন্দ করেনি। ঢাকাস্থ সেনাসদর দফতরের অনেকেই ওকে কম্যুনিস্ট কমাণ্ডার বলে টিটকারী দেয়া শুরু করলো। জাঁকজমক ও বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত, ভাড়াটে বাহিনীর সর্দারসুলভ মানসিকতার অধিকারী উচ্চপদস্থ অফিসাররা ও তৎকালীন সরকার তাহেরের এ সমস্ত কার্যকলাপে বিচলিত বোধ করতে শুরু করলো। প্রত্যক্ষ কমাণ্ড থেকে সরিয়ে সুবিধেজনক পদে বদলি করার লোভ দেখানো হলো তাকে। জেনারেল মিলিটারি পারচেজের ডিরেক্টর হিসেবে তাকে বদলি করা হলো। তাহের বললো, আমি কেনাবেচা শিখিনি—যুদ্ধ শিখেছি। ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করে তাহের সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করলো।

এরপর সে বন্যানিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ড্রেজার সংস্থার পরিচালক নিযুক্ত হয়। লোকসানী এ প্রতিষ্ঠানকে তাহের লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিল।

স্বামী হিসেবে আমি তার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলাম। ও কখনো বদমেজাজী ছিল না, ছিল সদালাপী। ভাইবোনদের ও খুব ভালবাসত। খাবার টেবিলে বসে ভাইবোনদের সাথে ও ঘন্টার পর ঘণ্টা বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করতো। স্ত্রী হিসেবে আমি তাহেরের জন্যে লজ্জাজনক কোন কাজ করেছি বলে মনে হয় না। জেল থেকে ও চিঠি লিখত—তোমার দায়িত্ব তুমি বুঝে নাও। আমি মনে হয় তার কথা রাখতে পেরেছি। তাহের সংসার কেন্দ্রিক ছিল না। জেল থেকে সে চিঠি পাঠিয়েছে অনেক, কিন্তু তারমধ্যে কোন ব্যক্তিগত আলাপচারিতা ছিল না ছিল দেশ ও জাতির কথা।

তাহেরের লেখার ব্যাপারে আমি ওর ডিকটেশন টুকে নিয়ে সাহায্য করতাম। তার টেলিফোন অন্য কেউ রিসিভ করুক ও সেটা পছন্দ করতো না, কাজটি আমাকেই করতে হতো। তার দৈনন্দিন রুটিন আমাকে মনে করিয়ে দিতে হতো। তার নোট বইয়ে নানা কাজের সময়সূচী আমাকেই টুকে রাখতে হত। আমি তাহেরের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলাম ওতপ্রোতভাবে।

নিজের সংসার খরচ তার মাসোহারায় না চললেও তাহের বামপন্থী সংগঠনকে সাহায্য করত। তাহের রাজনৈতিক সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হতে তাদের সাহায্য করত। আর সব সময় তাদেরকে দেশের মুক্তির লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করা যায় কিনা সে চেষ্টা করে যেত।

আমার দুঃখ হয়, আজো আমি তাহেরের স্বপ্ন, তাহেরের দেয়া কাজ সমাপ্ত করতে পারিনি। আজ আমি তেমন কোন কাজ করতে পারছি না। পরিবেশও নেই। সংসারের জন্যে, বাচ্চাদের জন্যে তাহের কিছুই রেখে যায়নি। সে শুধু বলত চিন্তা করো না। সমগ্র জাতির ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের ভাগ্য জড়িত। আজ আমি জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যস্ত। নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি। এ বাধার জন্যেই আমার এখন কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই।

তবে যে বিপুল কর্মকাণ্ড তাহের শুরু করে গেছে, বিশ্বাসঘাতক জিয়ার চক্রান্তে তা সাময়িকভাবে পরাজিত হলেও অবশ্যই সমগ্র দেশবাসী, তার সহকর্মীগণ, তাঁর সংগঠন সমাপ্ত করবেই। এদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব অবশ্যই সফল হবে। ইতিহাসে কীভাবে ওর মূল্যায়ণ হবে জানিনা তবে এদেশে তাহেরের স্বপ্ন শোষিত মানুষের রাজ কায়েম অনিবার্য।

একদিন জেল থেকে কৌতুক করে তাহের লিখেছিল, জলিল (মেজর এম এ জলিল) স্বপ্ন দেখেছে যে—আমি শত সহস্র সৈনিকের মাঝে সাদা হাতির পিঠে এগিয়ে চলছি। আর সবাই অবাক বিস্ময়ে ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এদেশে তো সাদা হাতি পাওয়া যায় না। লুৎফা, তুমি আমায় সাদা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে দিও।

অ্যালবাম

"নিঃশঙ্ক চিত্তের চেয়ে জীবনে আর
বড় কোন সম্পদ নেই"
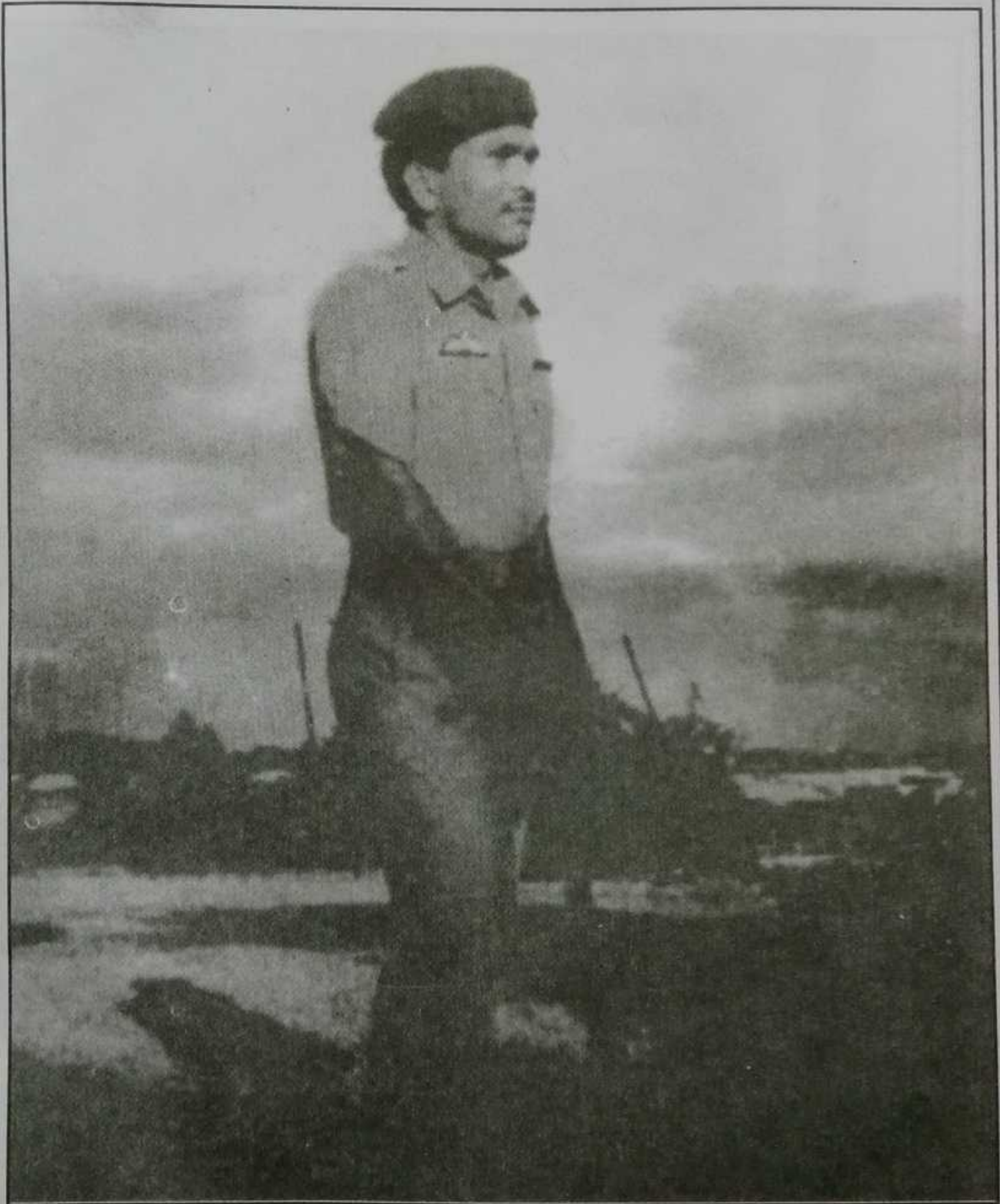
কর্নেল আবু তাহের বীর উত্তম
১৪.১১.১৯৩৮ - ২১.৭.১৯৭৬
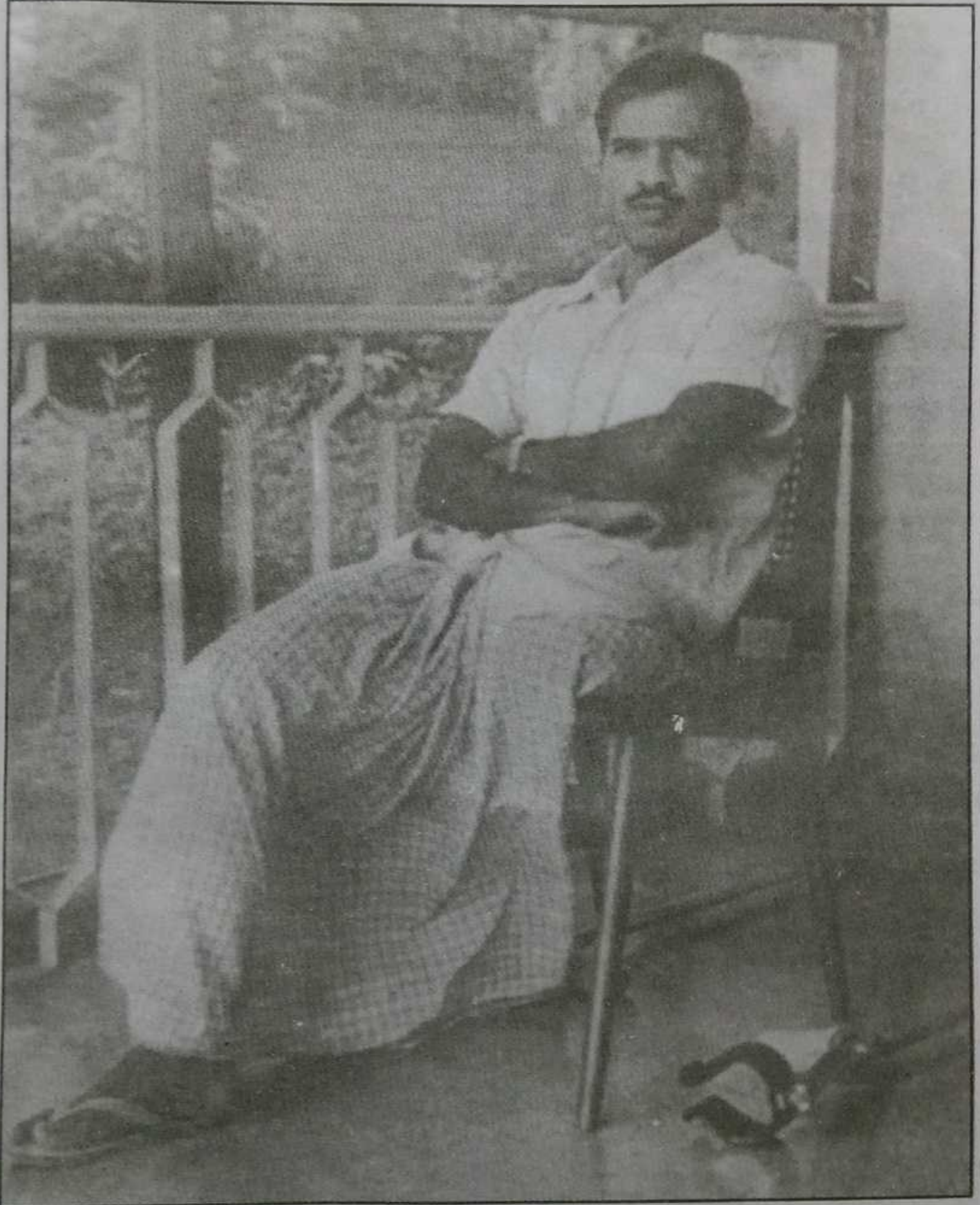
নারায়ণগঞ্জের বাসভবনে তাহের

বিভিন্ন বয়সে তাহের

কমান্ডো অফিসার তাহের

পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলে ক্যাডেট তাহের

স্বাধীনতার পর তাহের

ক্যাপ্টেন তাহের

'৫৭ সালে সিলেটের এমসি কলেজের হোস্টেলে তোলা ছবি। ছবিতে ডান থেকে দ্বিতীয় লাইনের ৩নং-এ তাহের। উপরে দাঁড়ানো ৩নং-এ তার সহপাঠী বন্ধু মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু। মঞ্জু '৭০ সালে লন্ডনে স্টুডেন্ট এ্যাকশন কমিটির কনভেনর এর দায়িত্ব পালন করেন। এ কমিটি '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ছবিটি তার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৭ আগস্ট '৬৯-এ বিয়ের আসরে তাহের

আমেরিকায় ট্রেনিং-এর সময়
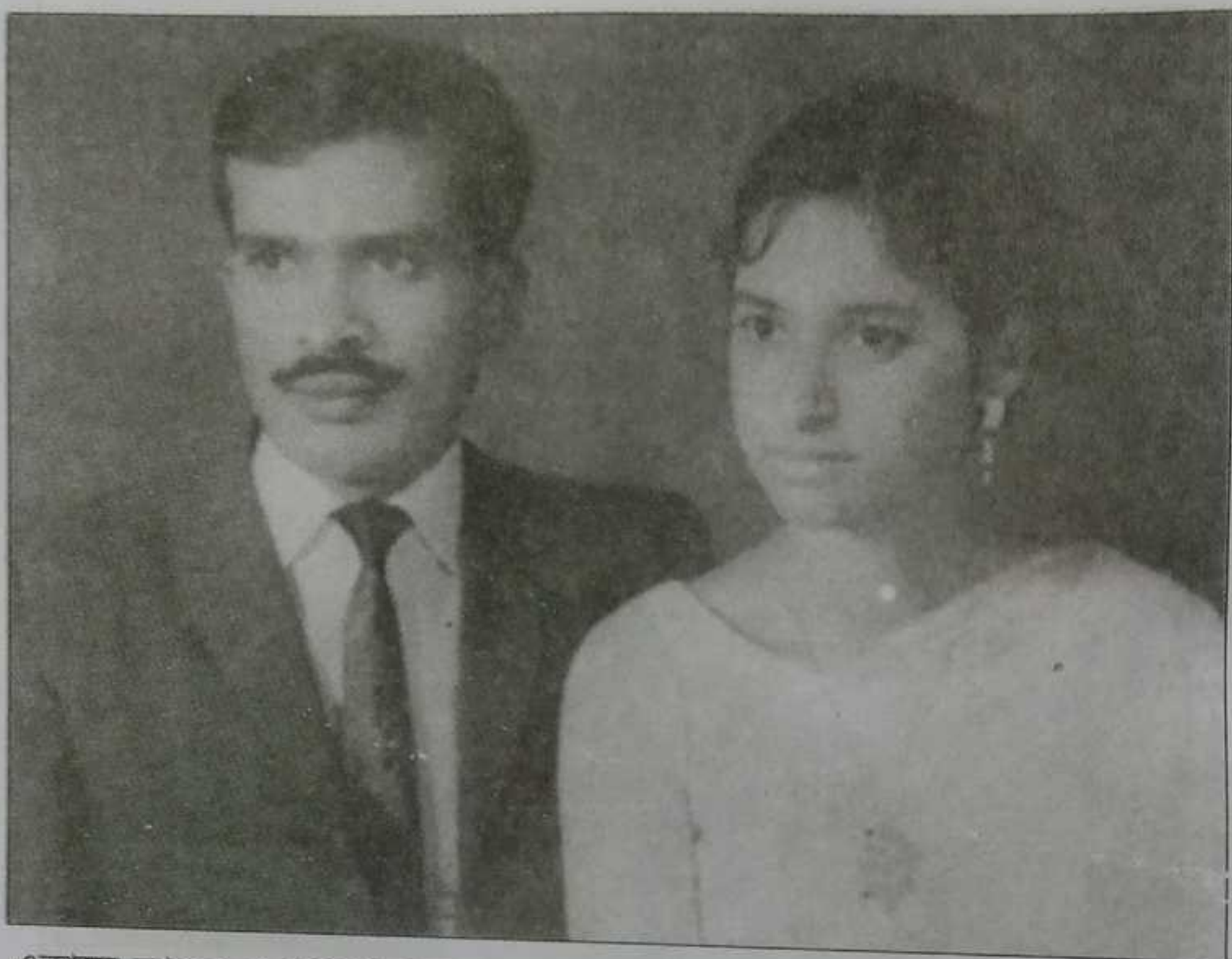
একান্তে তাহের ও লুৎফা তাহের

বিয়ের পর লন্ডনে

যুদ্ধের সময় আহত অবস্থায় ভারতের গৌহাটি হাসপাতালে তাহের। পাশে মিসেস তাহের ভাই ইউসুফ ও বোন ডলি।

স্বাধীন দেশে কামালপুর যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তাহের।

মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অনুষ্ঠানে প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানির সঙ্গে তাহের।

নারায়ণগঞ্জের বাসভবনে কর্নেল জিয়াউদ্দিন এবং সপরিবারে তাহের

নারায়ণগঞ্জের বাসভবনে বাম থেকে ডলির কোলে নিতু, লুৎফা, তাহের ও জলি

সেচ নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত-এর সঙ্গে আলোচনারত তাহের

নারায়ণগঞ্জে সেচ নিয়ন্ত্রণ অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে তাহের

বসা অবস্থায় তাহের ও স্ত্রী লুৎফা, পাশে দাঁড়ানো মেয়ে নিতু, সামনে দাঁড়ানো ছেলে যীশু এবং কোলে ছেলে মিশু

২৬ নভেম্বর '৭৫ সালে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে নিহত চারজন

শহীদ সাখাওয়াত হোসেন বাহার (আসাদ)
জন্ম : ৫ জুলাই ১৯৫৩, ময়মনসিংহ
(কর্নেল তাহেরের অনুজ)

শহীদ হারুন
জন্ম : ৭ নভেম্বর ১৯৫৩, টঙ্গী

শহীদ মাসুদ
জন্ম : ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬, খুলনা

শহীদ বাচ্চু
জন্ম : ৫ জুলাই ১৯৫৭, খুলনা

ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে নিহত আসাদ, হারুন, মাসুদ ও বাচ্চুর লাশ

‘কিছু কিছু মৃত্যু আছে যা মানুষকে মহান করে। ভালোবাসতে শেখায় আদর্শকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে কর্নেল তাহেরের মৃত্যুটিও এমনি একটি মৃত্যু। ক্ষুদিরামের ফাঁসির পরে উপমহাদেশে কর্নেল তাহেরের ফাঁসিই হলো সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ফাঁসি। স্বাধীন বাংলাদেশে মাত্র ৫ বছর পরে ’৭৬ সালে বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহেরের ফাঁসির ঘটনাটি ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবেই চিহ্নিত হবে। কর্নেল তাহেরের আদর্শ সঠিক ছিল না ভুল ছিল তার বিচার করবে ইতিহাস। তবে ভুল-ভ্রান্তি, দুবর্লতা সত্ত্বেও এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহের ছিলেন একজন সাহসী দেশপ্রেমিক। তাঁর সাহস তাঁকে পরিণত করেছিল কিংবদন্তীতে। ফাঁসির পূর্বেও তাঁর সাহসী কর্মকাণ্ড প্রেরণা যোগাবে ভবিষ্যৎ রাজনীতিবিদদের আদর্শের প্রতি সৎ থাকতে। দেশের প্রথম রাজনৈতিক ফাঁসিকে হাসিমুখে গ্রহণকারী তাহেরের নেতৃত্বে সংঘটিত ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের ফলাফল হিসেবে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের উত্থানকে চিহ্নিত করা গেলেও এ কথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, ইচ্ছে করে এই চক্রকে অভ্যুত্থানকারীরা ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন। তাহেরের জীবনের দিকে লক্ষ্য করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই তাহেরের জীবন, ৭ নভেম্বর থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী রাজনীতিবিদদের তাঁদের কর্মের দিকে এগোতে হবে। এ গ্রন্থে সত্যনিষ্ঠ থেকে ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি উদঘাটনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে–এ মৌলিক সত্যই আবার প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষের মৃত্যুই তাঁর শেষ নয়।’

ISBN 984 400 028 9
9 789844 000285